# নবপর্ণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

প্রকাশক
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

আশ্বিন ১৩৬০



মুদ্রাকর
শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস
ইন্দু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মূল্য দুই টাকা

# উপহার

# নবপর্ণ


| | | | |
|---|---|---|---|
| সিদ্ধবাবা | .. | .. | ১ |
| খোশ-খবর | .. | ... | ১৮ |
| লাখপতি | ... | ... | ২৯ |
| পূজার চাঁদা | ... | ... | ৩৬ |
| বাড়ীর খোঁজে | ... | ... | ৪৩ |
| পঞ্চানন্দের বৈঠক | ... | . | ৬১ |
| গাধা কি সিংহি হয় ? | ... | ... | ৮২ |
| যোগাযোগ | .. | ... | ১০৩ |
| মারণ-যজ্ঞ | ... | ... | ১১৬ |

# নবপর্ণ

## সিদ্ধবাবা

চলেছি বর্দ্ধমানে—সঙ্গে গৃহিণী মৃদুলা। ইষ্টিশনে খুব ভিড়; গাড়ী ছাড়বার আর বেশী দেরী নেই। আমাদের ছিল দেড়া-মাশুলের টিকিট, পাছে গাড়ী ফেল করি এই আশঙ্কায় একটু জোরে পা চালিয়ে এসে যে কামরাটা স্থমুখে পেলাম তাতেই উঠে পড়লাম।

ছোট্ট একটি কামরা—মাত্র তিনখানা বেঞ্চ। তার একখানা সম্পূর্ণ দখল করে বসেছিলেন আধ-বয়সী এক মাড়োয়ারী শেঠ ও তাঁর যুবতী পত্নী। পরে শুনেছিলাম, শেঠজীর নাম রেখাবচাঁদ খট্‌খটিয়া—বাড়ী জয়পুরে। বাকী দু'খানা বেঞ্চিতে বসেছিলাম আমরা বাংগালী স্ত্রী-পুরুষে ন' দশজন আর খট্‌খটিয়ার একজন সঙ্গী—আকারে তাকে জয়পুরের 'হিজ্ হেভিনেস্' বলা যেতে পারে। দূরপাল্লার যাত্রী শুধু খট্‌খটিয়ারা. আর সবাই ছিল নিকটের যাত্রী। কেউ চলেছেন মিহিজাম্, কেউ মধুপুর আর কেউ দেওঘর। কামরায় মোটঘাটের পরিমাণও নেহাৎ মন্দ ছিল না। কাজেই যাত্রীদের বেশ একটু ঘেঁষাঘেঁষি করেই বসতে হয়েছিল।

গাড়ী কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়েই ছাড়লো ; কিন্তু বিশ পঁচিশ গজ মন্থর গতিতে গিয়ে সেই সচল এক্‌সপ্রেস-ট্রেণ হঠাৎ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কোন য়্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটেছে মনে করে সকলেই উৎকন্ঠিত হয়ে পড়লাম ; কিন্তু তার কোন লক্ষণ না দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মালপত্র গোছাচ্ছি এমন সময় প্লাটফরমে খটাখট্ শব্দ শোনা গেল। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে একটু ঝুঁকে দেখলাম, একজন গেরুয়াধারী স্বামীজি সিগারেট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে খড়মের শব্দে প্লাটফরম মুখরিত করে আমাদের কামরার দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁর এক ফুট লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল সিগারেটের উড়ন্ত ধোঁয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়ায় উড়ছে।

কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত গেরুয়াধারীর পিছু-পিছু একজোড়া স্ত্রী-পুরুষও ছুটে-ছুটে আসছিলেন। এদের জন্যেই কি ট্রেণটাকে থমকে দাঁড়াতে হলো ? কথায় বলে, হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না।: সেই রকম রোজই দেখা যায় গাড়ী ফেল করে নিরাশ হয়ে বহু আরোহী ফেরে, কিন্তু চলমান ট্রেণ প্রায় ফেরেই না। নবাগত যাত্রীরা ট্রেণে এসে উঠলেন এবং উঠলেন আমাদেরই কামরায়। গেরুয়াধারীর মুখে পান, ট্যাকে দিয়াশ-লাই, আর হাতে একটি সিগারেটের টিন। সঙ্গী ভদ্রলোকটিও নিঃসম্বল ছিলেন না—একহাতে গেরুয়া রংগের একটি ঝোলা অপর হাতে পিতলের বেশ বড় একটি টিফিন-ক্যারিয়ার ; আর মহিলাটি বহন করছিলেন এক গা গহনা, একখানা পাখা, আরব্যোপন্যাসের 'রক' পাখীর ডিমের আকারের একটি ডিবা—নিঃসন্দেহে জর্দ্দাপানের গুদাম। মহিলাটির পাতাকাটা চুল, জমকালো শাড়ি, আন্দাজ একশ ভরি সোনাদানা আর পঞ্চাশ ভরি রুপার পানদান দেখে মনেই হয়নি ইনি ভদ্রলোকটির সহধর্ম্মিণী। ভুলটা

পরে ভেঙ্গেছিল। স্বামীজিকে কামরায় প্রবেশ করতে দেখেই রেখাবচাঁদ 'আইয়ে মহারাজজী' বলে হিজ হেভিনেসকে ইঙ্গিত করতেই সে মহারাজ-জীকে নিজের সিংহাসন ছেড়ে দিলে। স্বামীজি আরামে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন। ভক্তযুগল স্থানাভাব বশতঃ আমারই নাকের ডগার কাছ-টিতেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে আবার একটি কুলী মাথায় হোল্ড-অলের মুকুট পরে কামরার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তার স্বভাবতঃ পঞ্চমে-বাঁধা স্বরকে সপ্তমে চড়িয়ে আরোহী-সঙ্ঘকে সচকিত করে তুলছিল।

মহিলাটির ভোগান্তি দেখে স্বজাতির সম্মান সম্বন্ধে সদা সচেতন সদা-শয়া সহধর্ম্মিণী মৃদুলাদেবী কুলীর নিখাদে চড়ান গলাকে খাদে ডুবিয়ে আমাকে উপলক্ষ্য করে একটা ঝাঁজালো ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—বলি হ্যাঁগা, তুমি কেমনধারা ভদ্দরলোক বলত? মহিলাটি ঠায় দাড়িয়ে আর তুমি কিনা নবাব-পুত্তুরের মত দিব্বি বসে রয়েছ। ওঠ, দিদিকে বসতে দাও।—বসুন দিদি। মুহূর্ত্তে কামরার সকলের দৃষ্টি মৃদুলা-ম্যাগনেট আকর্ষণ করলে। আর এই সুযোগে সকলের অলক্ষ্যে বেশ সপ্রতিভ ভাবে মধ্যযুগের নাইট-এরাণ্টের মত আমি উঠে পড়লাম। দিদি তিলার্দ্ধ দেরী না করে আমার ত্যক্তাসন অধিকার করে বসে পড়লেন। গার্ড-সাহেবের হুইস্‌ল শোনা গেলো, গাড়ী আবার আড়মোড়া ভেঙ্গে চলতে সুরু করল। আমাতে আর হোল্ড-অলের মালিকে মিলে হোল্ড-অলটাকে টেনেটুনে গাড়ীতে তুললাম। কুলীটা একটা সিকি পেয়েও গজ্ গজ্ করতে কসুর করল না। যার যা স্বভাব।

গাড়ী চলতেই মৃদুলা উঠে এসে তার 'দিদি'র পাশে কায়েম হলেন আর দিদিও জর্দা-পানের সদাব্রত খুলে আলাপ জমিয়ে তুললেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তারা যেন সত্যিকারের সহোদরা হয়ে পড়লেন— কত কালের আলাপী, কত কালের অভিন্ন-হৃদয়া বান্ধবী। আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই স্ত্রীজাতির। এরা আপনজনকে পর করতে যেমন পারে, তেমনি পরকেও আপন করতে জানে। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী কি না জানি না, তবে স্ত্রীজিহ্বা যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী এটা প্রত্যক্ষ দেখলাম।

গাড়ী কর্ড-লাইন ধরে চলেছে। রেখাবচাঁদবাবু স্বামীজির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ দহরম-মহরম করে ফেলেছেন। দু'জনেই শেয়ার- মার্কেট আর সোনা-চাঁদির ভাও নিয়ে মেতে উঠেছেন। স্বামীজি এরি মধ্যে দু' গণ্ডা সিগারেটের অগ্নি-সংকার আর তমালকান্তি আধডজন পান নিঃশেষে চর্ব্বন করেছেন। ভক্তিমতী 'দিদি' ঘন ঘন পাখার বাতাস আর পান-জর্দা বিতরণ করছিল এবং বারংবার যাচাই করছিল।—'দে, বেটি দে, না দিয়ে ছাড়বি নে'—বলে বাবা ভক্তের দান গ্রহণ করছিলেন।

পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী পণ্য ও পুণ্যব্যবসায়ীর এই অশোভন আলাপ আলোচনায় বিরক্ত হয়ে হোল্ড-অলের মালিকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। ইনি স্বামীজির একজন ভক্ত; পোষাকে-আষাকেও তাঁরই খাঁটি সাগরেদ। পরনে কাছা-কোঁচাহীন গেরুয়া ধুতি, চরণে বিদ্যাসাগরী চটি, মাথায় পো'টেক হাত লম্বা টিকি আর মুখে এক জোড়া সাদা গোঁফ ও দেহটি কৃশ হলেও দণ্ডেরই মত দৃঢ়, সরল; বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে —নাম অতুলানন্দ পাল। সার্থক এই নাম। রূপে পোষাকে

ব্যবহারে লোকটি অতুলও বটে। আর গুরুসেবার আনন্দেও ভরপুর।

পাল মশায়ের অন্তর-সমুদ্র মন্থন করে যে রত্ননিচয় পাওয়া গেল তার সংক্ষেপ তালিকা এই—যৌবনে রংগপুর জেলার রংগটি ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ; দশ বৎসর আগে স্বামীজির দর্শন লাভ করেন পদ্মাবক্ষে—ষ্টিমারের ওপর। মাঝ নদী দিয়ে ষ্টিমার চলছিল, হঠাৎ স্বামীজি এসে উঠলেন খড়ম পায়ে নদী হেঁটে। পাল মশায়কে দেখেই বললেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে পাগল হয়েছিস, কিরীটেশ্বরে যা, দর্শন পাবি। কিরীটেশ্বরেই পাল মশায়কে দীক্ষা দেন স্বামীজি। স্বামীজি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, অলৌকিক তাঁর ক্ষমতা, অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য। রাস, দোল আর ঝুলনের সময় ব্রজ-রমণীরা কিরীটেশ্বরে আসেন। সে সময় ভাগ্যবান ভক্তেরা স্বামীজির সাধন-মন্দিরে নূপুরধ্বনি, মুরলীরব, ময়ূর-কোকিলের ডাক শুনতে পান আর ছিন্ন ফুলমালা ও আবির কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। পাল মশায়ের বিবৃতি শুনে মহিলাদের মুখে বিস্ময়, যুবকদের চোখে কৌতুক আর আমার বুকে সংশয় জেগে উঠল।

স্বামীজি সম্বন্ধে আরো কিছু তত্ত্বকথা শোনবার আশায় পাল মশায়কে জিজ্ঞাসা করলাম—স্বামীজি কোথায় চলেছেন ?

—আশ্রমে। পাল মশায়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—আশ্রমটি কোথায় ?

—অজয়তীরে—কিরীটেশ্বরে।

—নামটি জানতে পারি কি ?

—সিদ্ধবাবা শ্রীশ্রীআগমানন্দ বিদ্যাবারিধি স্বামী মহারাজ।

—বিদ্যাবারিধি? ইনি কি খুব পণ্ডিত?

—বলেন কি মশাই—এর মত সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ আর কে আছেন? আগম, নিগম, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ ও বৈদিক শাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্য দেখে কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় ও উৎকলের শাস্ত্রাচার্য্যগণ স্বামীজিকে বিদ্যা-বারিধি উপাধি দিয়েছেন।

—ইনি কি বাঙ্গালী!

—ইনি যে কি তা বলা শক্ত। তবে বাঙ্গালী নন।

—বেশত বাংলা বলছেন।

—বাংলা কি বলছেন? ইংরিজী, ফরাসী, জার্ম্মাণী, তেলেগু, তামিল, হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠি, উড়িয়া, পুস্ত, গুরুমুখী—সব ভাষা অনর্গল বলতে পারেন।

এই উদ্ভট উত্তরে একটু উন্মনা না হয়ে পারলাম না। লোকটা বদ্ধ পাগল নয় ত? যাচাই করবার মতলবে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—শিষ্যেরা বুঝি সবই বাঙ্গালী?

—না, বহু জাতীয়।

—শিষ্য সংখ্যা কত?

—অসংখ্য।

নাঃ লোকটা নেহাৎই পাগল। পাল মশায়ের সঙ্গে আলাপে ইস্তফা দিয়ে স্বামীজির দিকে মুখ ফেরাতে দেখলাম, তিনি সিগারেট টান্‌ছেন আর খটুখটিয়ার হাতখানা নিজের হাতের ওপর রেখে নিবিষ্ট মনে ভাগ্য গণনা করছেন। কি বলেন শুনবার জন্যে খটুখটিয়া-গৃহিনী একহাত লম্বা

ঘোমটাটি দু'হাতে উঁচু করে স্বামীজির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন। রেখাবর্চাদের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে স্বামীজি 'দিদি'র দিকে চাইতেই জর্দা-পান হাজির। স্বামীজি একসঙ্গে গোটা-চার জর্দা-পান মুখে পুরে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করতে লাগলেন।

প্রবল উৎকণ্ঠার স্বরে রেখাবচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন—কি দেখলেন মহা-রাজজী ?

মহারাজজী স্মিতমুখে বললেন—দেখলাম তোমার দুটি খুব প্রবল বাসনা—পুত্র ও অর্থলাভ ; কিন্তু উভয় স্থানের দেবতাই বিষম বক্র।

হতাশভাবে রেখাবর্চাদ বললেন—তা' হলে কি আমার অর্থ আর পুত্রলাভ হবে না ?

—কে বল্‌লে হবে না ? বক্র পুলিশের মত বক্র গ্রহও ঘুষ পেলেই বক্রভাব ত্যাগ করে সোজা হয়—শুভ হয়।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি বলতে চান দেবতারা ঘুষ খান ?

আমার প্রশ্ন শুনে দিদি ও পাল মশায়ের মুখ চোখ রাগে রাঙাজবা। স্বামীজির কথার ওপর কথা ! এত বড় আস্পর্দ্ধা !—মনের ভাব যেন অনেকটা এইরকম। স্বামীজি গভীর জলের মাছ ; বাইরে কোন রাগ-বিরাগ নেই। আমার দিকে প্রসন্নমুখে চেয়ে উত্তর দিলেন—খান বই কি ? দেব-রোষ, গ্রহ-দোষ প্রভৃতি দৈবদৌরাত্ম্যের শান্তির জন্যেই না শাস্ত্রকার-গণ যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দিয়েছেন। মানুষ খুসি হয় টাকা-পয়সা পেলে, আর দেবতারা খুসি হন ফুল-চন্দন পেলে। কার্য্যত দুই-ই ঘুষ।

রেখাবচাঁদ বাবু বললেন—ঠিক বলছেন, মহারাজ; ঘুষ পেলে বড় সাহেবভী খুশ হয়।

আমি বললাম—দেবতার প্রীতির জন্যে পূজা-অর্চনাকে ঘুষ বলা চলেনা।।

মৃদুলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গড় গড় করে কি যে বললেন 'দিদি' গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে কিছুই শোনা গেল না। হয়ত আমারই বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পেশ করলেন। অকস্মাৎ নিদাঘের অশনির মত ভেঙ্গে পড়লেন মৃদুলা—থামো বলছি। নিজে যেমন কালাপাহাড়, সবাইকেও তাই মনে কর। পূজা-আচ্চা ঠাকুরদেবতার কি জানো তুমি? মৃদুলার কথার জের টেনে 'দিদি' স্নরু করলেন মিহিস্থরে—হিঁদুর ঘরের ছেলের ইকি কালা-পাহাড়ি ঢং। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে যে সমীহ করে কথা কইতে হয় এও কি বলে দিতে হয়? বাবা কি যে-সে মনিষ্যি। মানুষের দেহে সাক্ষাৎ ভগবান। গাড়ীটাত ছেড়েই দিয়েছিল; বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা তুলে থামিয়েছিলেন বলেই উঠ্‌তে পারলাম।

—ও সব গুহ্য কথা এঁদের কাছে ফাঁস করছো কেন, রাধারাণী! এঁরা যুক্তিবাদী—ভক্তের মত বিশ্বাসের জোরে ভগবানকে স্বীকার করা এঁদের স্বভাববিরুদ্ধ; এঁরা চান তাই তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভক্তের চক্ষে যে ভগবান, যুক্তিবাদীর কাছে সেই হয় শয়তান। দাও দিকি রাধারাণী গোটা কয়েক পান আর এক চিম্‌টি জর্দ্দা—বলেই স্বামীজি রাধারাণীর দিকে হাত বাড়ালেন।

রাধারাণী পান-জর্দ্দা দিতে দিতে বললেন,—কেন বলবো না? এতো আর শোনা কথা নয়, সকলই ত নিজের চোখে দেখেছি। পারুক না দেখি কে পারে আঙ্গুল নেড়ে চলন্ত গাড়ী থামিয়ে দিতে।

স্বামীজি টিনের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে খালি টিনটা আর কাঠি-শূন্য দিয়াশলাইয়ের বাক্সটাকে জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। পাল মশায় সসব্যস্তে থলির ভিতর থেকে একটা আনকোরা সিগারেটের টিন আর এক বাক্স দিয়াশলাই বাবার হাতে দিলেন। স্বামীজি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—রাধারাণী, ও তোমাদের মেয়েলী জিদ। বল্‌তে চাইলে কি বলতে পারবে তোমার এই পাগল ছেলের দু শ বছরের জীবনের প্রত্যেকটি খুটি-নাটি ?

মৃদুলা বিস্ময়-বিস্ফারিত পদ্মপলাশ নয়নে হাঁ করে 'বাবা'র প্রত্যেকটি কথা উদরস্থ করছিলেন। বাবার বয়স দু'শ বছর পেরিয়ে গেছে শুনে ভক্তিতে গলে পড়লো।

বাবাকে হাত-পাখার বাতাস করতে করতে দিদি বললেন—'তা না পারি দু-দশটাত বলতে পারবো। মানুষের মধ্যে শ'কে শ'ইত আর কালাপাহাড় হয় না। বাবার জীবন-কথা শুনে কোটাকে গুটিও যদি ভক্ত হয়, বিশ্বাসী হয়, সেও ত কম ভাগ্যির কথা নয়।

বাবা মুখে একটু হাসির আমেজ টেনে বললেন—না রাধারাণী, তুমি বাংগালীকে ঠিক চেন না। জগতের সেরা নাস্তিক তারা। তাদের কোটিকে গুটিও ভক্ত হয় না; তারা চিরদিনই দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাহীন। শাস্ত্রে অবিশ্বাসী।

একটু ভড়কে গিয়ে রাধারাণী বললেন—সে কি বাবা ? কত লাখো-লাখো বাংগালী ত আপনাকে ভক্তি করে, আশ্রমে আসে।

স্বামীজি বললেন—হ্যাঁ আসে সত্যি ; কিন্তু ভক্তিবিশ্বাসের টানে আসে

না। তারা আসে সস্তায় রোগ সারাতে, আর কি করে সে রাতারাতি লাখোপতি হবে তার সন্ধানে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেই সাধুসন্ত জোচ্চোর, বাটপাড়, আরো কত কি?

পাল মশায় ক্ষুণ্ণ মনে বললেন—সেবার কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের দিন লাখো-লাখো লোককে একফালি চাঁদ দেখিয়েছিলেন—করেছিল কেউ অবিশ্বাস?

স্বামীজি বললেন—কেন করবে? তারা ত বাংগালী ছিল না? তারা ছিল তুলসীদাসের দেশের লোক; সকলেই ভক্ত, সকলেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী।

রাধারাণী বললেন—কেন, হরিদ্বারেও লাখো-লাখো বাংগালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবীর সুমুখে অযোধ্যা মহারাজের শান-বাঁধান উঠোনে লিচুর শুকো আঁঠি রেখে দশ মিনিটে গাছ জন্মিয়ে সবাইকে পাকা লিচু খাইয়েছিলেন। কৈ, সে ক্ষমতা ত বাংগালীরা অবিশ্বেস করে নি?

আমার নাস্তিক বুদ্ধিতে লজ্জিত হয়ে 'দিদি'র হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বাবাকে বাতাস দিতে দিতে মৃদুলা বললেন—এই নাস্তিক মনিষ্যের কথায় রাগ করবেন না, বাবা। ওঁর স্বভাবই ঐ রকম, ঠাকুর-দেবতা কিছুই বিশ্বেস-টিশ্বেস করেন না। সাধুমার আদেশে—তিনি সাক্ষাৎ ছিন্নুগ্গা, ভোর ঘোর থাকতে উঠে একটু জপ তপ করি বলে ওঁর কাছে কি কম টিটকিরীটা সইতে হয় আমাকে।

স্বামীজি মৃদুলাকে রাক্ষস কুলে সরমার মত ভক্তিমতী দেখে সপ্রসন্নভাবে বললেন—তোমাদের মত ভক্তিমতী মায়ের দল দেশে আছেন বলেই এই লাখো লাখো বছরের হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম আজও টিকে আছে। পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও মা, ওরা চিরদিনই ধর্ম্ম ও দেব-দেবীর

কথা হেসে উড়িয়ে দেন। শোন মা তবে একটা অতি গোপন কথা। কেরল দেশে যখন ছিলাম, সে সময় নিত্য এক কুড়ি নারকেল খেতাম। আস্ত নারকেল যেমনটি ঠিক তেমনটি পড়ে থাকতো দেখে ভক্তরা প্রসাদের লোভে খেতে গিয়ে ভেঙ্গে দেখেতো ভোঁ ভোঁ—এতটুকুও শাঁস নেই ভেতরে! ঠিক যেন হাতী-খাওয়া কয়েৎবেল!

দিদি সহাস্যে বললেন—আমরা কিন্তু বাবাকে অমন ক র নারকেল খেতে দেখিনি।

স্বামীজি বললেন—দেখবে কি করে? দশভূজা বৌঠাকরুণ যে বাদ সাধলেন। একদিন সমুদ্রের খাঁড়ির পাশে নারকেল বনে বসে আছি এমন সময় স্বয়ং গণেশজননী দেখা দিয়ে বললেন—ঠাকুরপো ওকি নারকেল খাওয়ার ছিরি! ছি অমন করে আর খেও না। তোমার নারকেল খাওয়া দেখে আমার গণেশও বায়না ধরেছে সেও তার কাকার মত নারকেল খাবে। দ্যাখো দিখি বে-আড়া ছেলের আবদার! বেল খাচ্ছিস্ খা, নারকেল আবার কেন? অতটুকু কচি ছেলে বাঁচবে, অমন করে খেলে? না ভাই ঠাকুরপো, পাগলকে শাকের ভূঁই দেখিয়ো না, নারকেল খাওয়া ছেড়ে দাও। সে আজ দু'শো বছর আগের কথা। সেই থেকে নারকেল খাওয়া ছেড়েছি।

আমি চোখে কৌতুকের অঞ্জন লাগিয়ে বললাম—আমাদের মত ভেংগে কুরিয়ে খেলেই ত পারেন।

স্বামীজি একটু বঙ্কিম হাসির সঙ্গে বললেন—দেখ্‌লে ত রাধারাণী পুরুষের মন। যা পার্ব্বতী বিশ্বেস করেন, তোমরা বিশ্বেস করো. এঁরা তা করতে রাজী নন! দোষ এঁদের নয়, এ দেশের মাটির। যা ইংরেজ,

আমেরিকান, জাপানীরা বিশ্বেস করেন বাংগালী তা আষাঢ়ে গল্প মনে করে হেসে উড়িয়ে দেয়।

পাল মশায় যাত্রীদের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে, বাবার দিকে তাকিয়ে একটু চড়া গলায় বললেন—আপনার কৃপাপ্রার্থী রণ-সংকটে বিপন্ন চার্চ্চিল সাহেবের ঘটনাও এঁরা হয়ত অবিশ্বাস করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

বিশেষ করে আমার দিকে কুটিল দৃষ্টি হেনে স্বামীজি আবার শুরু করলেন—ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিলে, অতুল। শুনুন সকলে সাহেব-দের গুণ-বিশ্বাসের কথা। এরা বাংগালীর মত অপদার্থ একগুঁয়ে গোঁয়ার নয়, গুণের আদর জানে। ঠেকায় পড়লে ভারতীয় গুণীদেরও তোষামুদি করে কাজ হাসিল করে। এই চার্চ্চিলের কথাই ধরুন। খুব হুঁসিয়ার লোক কিনা, পুরণো পত্রের ফাইল ঘেঁটে ঠিক ঠিক বের করেছিল আমার সাহায্য নিয়ে ক্লাইভ আর্কট আর পলাশীর যুদ্ধ জয় করে। জাপানীরা কোহিমায় ঘাঁটী গেড়েছে—মিত্রপক্ষের অবস্থা অনেকটা "কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়," ইংরাজ-আমেরিকানকুল ভয়ে আকুল। চার্চ্চিল স্পেশাল এরোপ্লেনে ক্রিপ্‌স্‌কে পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। মিত্রপক্ষের এই দুর্দ্দিনে বাধ্য হয়ে যেতে হলো ক্রিপসের সঙ্গে মণিপুরে। যত এরোড্রোম ছিল সবগুলিকে মন্ত্রের দ্বারা সুরক্ষিত করলাম। জাপানীদের সাধ্য হয়নি তার একটিকেও ঘায়েল করতে। মণিপুরের রাজবাড়ীর প্রশস্ত চত্বরে ক্রিপ্‌স্‌-ওয়াভেলের তত্ত্বাবধানে জাপনিসূদন যজ্ঞ করলাম উদয়াস্ত অবধি। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলাম সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যও ডুব দিলেন, আর—

আমি জোর করে ধরে রাখা মৌনতা হারিয়ে ফেললাম, একটু শ্লেষের

সুরেই স্বামীজির চটুলতা থামিয়ে দিয়ে বললাম—আর যজ্ঞকুণ্ড হতে চতুর্ভূজ বিষ্ণু চার হাতে চারটী লক্ষঘাতী বোমা নিয়ে বোধ হয় দর্শন দিলেন।

স্বামীজি আমার শ্লেষটা যেন বুঝলেন না এমন একটা ভাব দেখিয়ে চতুরচূড়ামণি নটের মত হঠাৎ মুখে চোখে অপূর্ব্ববিস্ময়ের ভাব মাখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তাই ত মশায়, এ-সব গোপন খবর আপনি জান্‌লেন কি করে? নিশ্চয় আপনি জাপানীদের গুপ্তচর—ইংরাজের দুষমন।

সভয়ে মৃদুলা বললেন—না বাবা উনি গুপ্তচর নন, গুপ্তচেরী প্রেসের ম্যানেজার।

স্বামীজি হো হো করে উচ্চ হেসে বললেন—ঠিকই হয়েছে, সে জন্যেই যতসব গুপ্তখপর রাখেন। পরে কি হলো তাও শুনুন সকলে। বোমা চারটি ক্রিপ্‌স্-ওয়াভেলকে দিতে যেতেই তাঁরা ত ভয়ে দৌড় দিলেন—পড়ি ত মরি। আমি আর কি করি? তখুনি বাধ্য হয়ে উড়ু-জাহাজে আমেরিকা গিয়ে চারটি বোমাই ট্রুম্যান সাহেবকে দিলাম। এই যজ্ঞের ফলেই মিত্র পক্ষের জয় হয় যুদ্ধে। সাম্রাজ্যের এই মহোপকারের জন্য চার্চ্চিল আমাকে ( Saviour Temporal of Empire & America ) সাম্রাজ্য ও উত্তর আমেরিকার মানব-ত্রাণকর্ত্তা—উপাধি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করি।

রাধারাণী বললে—সেবারও ত বাবা কাশীতে ইন্দ্রযজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ শেষ হতে না হতেই মেঘে ছেয়ে ফেললে আকাশ। তিন দিন তিন রাত্রি সে কি বৃষ্টি। সহরে সাঁতার জল।

বাবা সপ্রসন্ন মুখে বললেন—বেটীর সব মনে আছে দেখছি।

রেখাবচাঁদের কানের কাছে ঘোমটা-ঢাকা মুখখানি কি যেন গুন্ গুন্ করলে। রেখাবচাঁদ জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করলে—মহারাজজী. যজ্ঞ করলে অর্থ ও পুত্রলাভ হবে?

স্বামীজি বললেন—শাস্ত্রানুসারে করলে না হবে কেন? তবে ইংরাজীতে একটা কথা আছে (When it pleases not God, the Saint can do little.)—ঈশ্বরের যেখানে অনিচ্ছা সাধুসন্তকে সেখানে হার স্বীকার করতে হয়।

রেখাবচাঁদ বললে—কলিকালে কি যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়?

স্বামীজি বললেন—যায় বই কি? তবে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশুদ্ধ ভাবে হওয়া চাই। এই ত সেদিন রাজা শিবপ্রসাদ গর্গের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্যে আমারই ডাক পড়েছিল। যজ্ঞবিধি দেখবার জন্যে গভিলের গৃহ্য-সূত্রখানি পড়ে ত আমার চক্ষু স্থির। সূত্র ভুল, টীকা ভুল, বর্ণ ভুল—ভুলের ছড়াছড়ি। সূত্রাদি সংশোধন করে যজ্ঞ করলাম; ফল হাতে-হাতে পাওয়া গেল। চরু-স্থালী হাতে ব্রহ্মা দর্শন দিলেন। চরু খেয়ে দশ মাস দশ দিন পরে রাণী মা দেব-দুর্লভ পুত্রলাভ করলেন।

রেখাবচাঁদ ব্যবসায়ী লোক, হুসিয়ারীর এতটুকু ত্রুটি নেই। কোন যজ্ঞে কত ব্যয় পড়বে তা জেনে নিয়ে যক্ষযজ্ঞই আগে করা স্থির করলেন এবং জোড় হাতে মহরাজজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—যক্ষযজ্ঞে কত টাকা পাবো?

স্বামীজি বললেন—মূল দক্ষিণার শতগুণ, হাজারে লাখ, লাখে কোটী।

রেখাবচাঁদ বললেন—কোথায় করবেন যজ্ঞ?

স্বামীজি বললেন—অজয়তীরে—কিরীটেশ্বরে।

পাল মশায় বললেন—ঐখানেই ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আপাদ মস্তক সাহেব, ধোঁয়াটে রংগের চশমাধারী একজন সহযাত্রী বিরক্তির সঙ্গে বললেন—Nonsense! All bosh!—যত বাজে কথা?

পাল মশায় চটেমটে বললেন—কোনটা মশায়ের নিকট বাজে কথা হলো, শুনি?

চশমাধারী বললে—এ লক্ষ-ঘাতী বম, গৃহসূত্র সংশোধন, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, বৌদি-ঠাকুরপো সংবাদ—কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

পাল মশায় বললেন—আপনারা ইংরেজের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেই মস্তবড় পণ্ডিত সেজে বসেন। শাস্ত্র পুরাণের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষেন না। বেদ-ব্যাসের সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চ লক্ষণা-ক্রান্ত আনন্দ পুরাণে হর-পার্ব্বতী সংবাদে অসীমানন্দ বিভূতি অধ্যায় পড়ে দেখবেন, ঠাকুর যা বললেন, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

চশমাধারী বললেন—আনন্দ পুরাণ বলে আবার কোন পুরাণ আছে নাকি?

তবেই দেখুন,—পাল মশায় বললেন—শাস্ত্র জ্ঞান আপনার কত সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। আর এই তুচ্ছ জ্ঞানগরিমা নিয়ে সফরীর মত ফর ফর করছেন—জ্ঞান-সাগরের তিমিঙ্গিলের সঙ্গে—যিনি স্বয়ং গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ।

পাল মশায়ের বাক-পারুষ্যে কামরার ভেতর একটা বিশ্রী পরি-বেশের সৃষ্টি হ'ল। এতক্ষণ যা স্রেফ বাক্‌যুদ্ধই ছিল এখন তা বাহুযুদ্ধে পরিণত হবার জোগাড় হল। মৃদুলা পর্য্যন্ত শাড়ির আঁচল কোমরে

# খোশ-খবর

আমাদের গাঁয়ের অকিঞ্চন দাস—যিনি পঞ্চাশ বছর আগে জোছনা-ঝলমলে এক বাসন্তী-রাতে বরবেশে বিয়ের বাসর জেগেছিলেন, তিনি হঠাৎ এক দুর্দিনে গৃহলক্ষ্মীকে হারিয়ে বসলেন। এত বড় শোকের টালটা তিনি সামলাতে পারলেন না। তাঁর অন্তরের আকাশে এক নিমেষে শশী-সূর্য্য অস্ত গেল, মলয় থমকে দাঁড়াল, উষা গোসা করে মুখ মলিন করলে। জীবনের যা-কিছু মিষ্টতা, সরসতা, সে-সব ফুরিয়ে তিনি রাতারাতি বিরহী যক্ষের মত প্রেমাতুর হয়ে পড়লেন—দিনরাত হতাশে, হুতাশে কাটতে লাগল।

অশৌচান্তে আত্মীয়-স্বজন ভাবল, এবার হয়ত শোকটা নরম পড়বে. কিন্তু জগতে ভাবনার অনুরূপ কাজ হয় না। অকিঞ্চনের অধীরতা কিছু মাত্র না কমে বেড়েই চলছিল দেখে পুত্র নিবারণ ভয় পেয়ে গ্রামের মাতব্বরদের শরণ নিলে।

অকিঞ্চন ছিলেন গাঁয়ের তালুকদার। তাঁর বাপপিতামহ বংশবাটী পরগণার নায়েবী করে বেশ দু' পয়সা রেখে গেছেন। কথায় বলে —বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। কথাটা অকিঞ্চনের সম্বন্ধে হুবহু খেটে গেল। বাবা মারা যেতেই তিনিও জন্মগত অধিকারের দাবীতে বংশবাটীর নায়েবী-গদির কায়েমী গদিয়ান হয়ে বসলেন। বছর পাঁচেক পার না হতেই বাপ-ঠাকুরদার ওপর টেক্কা মেরে তাঁদের আমলের খড়ো ঘর ভেঙে বাড়ীতে দালান-বালাখানা তুললেন, বারো মাসে তেরো

পার্ব্বণের পত্তন করলেন। নায়েবী পদ প্রাপ্তির পনের বছরের পর যখন তালুক-মুলুক কিনে তালুকদার হলেন, গ্রামের লোকের তখন দিব্যদৃষ্টি লাভ হল; তারা অকিঞ্চনের স্বরূপ টের পেয়ে বিরূপ হলেও গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা মনে করে তাঁর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হল।

এ-হেন অকিঞ্চনের স্ত্রী-বিয়োগে গ্রামের কচি-কাঁচা থেকে শ্মশান-যাত্রী বুড়ো-বুড়ীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। সকলেই মনে করলে, অকিঞ্চন যখন গৃহলক্ষ্মী হারিয়েছে তখন ভাগ্যলক্ষ্মী ছেড়ে যেতে আর কতক্ষণ? যারা অপরের শোকে-দুঃখে সুখী হয় না এমন দু'দশজন, আর যারা গায়ে-পড়া, ধামা-ধরা তারাই শুধু সহানুভূতি দেখালে অকিঞ্চনের শোকে।

নিবারণ ছেলেটি ছিল যাকে বলে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ—শিষ্ট, শান্ত ভদ্র। সে যখন এসে মাতব্বরদের দ্বারস্থ হল তখন গাঁয়ের প্রবীণদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। অকিঞ্চনের স্বপক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ সকলেই সুমন্ত্রণা দিতে অধীর হয়ে উঠল। স্বপক্ষ যারা অর্থাৎ ধামা-ধরার দল, তারা নিবারণকে বাপের 'দ্বিতীয় পক্ষ'-এর ব্যবস্থা করতে বললে। বিপক্ষ দল একথা শুনে চটে উঠে বললে, তারা ইস্কুল-কলেজে-পড়া ছেলের দলকে এমন ক্ষেপিয়ে তুলবে যাতে গ্রামে একটা 'গজ-কচ্ছপ'-এর লড়াই বেঁধে ওঠে। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে নিবারণ অসহায় হয়ে পড়ল দেখে নিরপেক্ষ দল এগিয়ে এল। তাদের সালিশীতে একটা ঘরাও নিষ্পত্তি হয়ে গেল। নিবারণ বাপকে নিয়ে তার কার্য্যস্থল কলকাতায় ফিরে গেল। গ্রাম ঠাণ্ডা হল।

সহরে এসেও অকিঞ্চনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। এখানেও কুণো বেড়ালের মত ঘরের কোণে চুপটি করে বসে ভাবে, কি অপরাধে আকালে কালবৈশাখী তার সাজানো বাগানের কল্পলতাকে ছিন্নমূল করলে? সময়ে নায় না, খায় না, কেবলি ভাবে, আর ভাবে। নিবারণ আর মানসী পড়ল মহা মুস্কিলে।

নিবারণরা থাকে কালীঘাট রোডে—মায়ের মন্দিরের অতি নিকটে। তারা অকিঞ্চনকে মন্দিরে নেবার জন্যে কত সাধ্য-সাধনা করে; সে কিছুতেই রাজি হয় না। তার মুখে প্রতিদিনই এক কথা—আহা গিন্নীর কত সাধ ছিল মাকে জোড়ে দর্শন করবেন; তার সে সাধ পূর্ণ হয়নি, আমি কোন্ প্রাণে মন্দিরে একা একা দর্শনে যাব।

নিবারণ ও মানসী দু'জনেই বলে—একা একা যাবেন কেন বাবা, আমরা সঙ্গে যাবো, কেলো, ভোলা, ফেলী—তারাও যাবে। অকিঞ্চনের নাতি-নাতনীরা আহ্লাদে মেতে উঠে, ধেই-ধেই নাচে, নিবারণ সতৃষ্ণ চোখে চায়, মানসী আর্ত্তির সঙ্গে শ্বশুরের উত্তর প্রতীক্ষা করে। অকিঞ্চন তাদের অনুরোধ এড়াতে পারে না; সজল চোখে সম্মত হয় এবং জগতের সকল লোকের সকল অভিযোগের চাঁদ-মারি বিধাতা পুরুষকে দোষ দেয়।

অকিঞ্চন রোজই সকাল-বিকাল মন্দিরে যায়, কিন্তু মনে একটুও সুখ পায় না, শান্তি পায় না। শ'য়ে শ'য়ে স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীর হৈ-চৈ ছুটাছুটি; সকলের মনে আনন্দের উৎস উথলে উঠেছে—শুধু তারই অন্তরে আনন্দের অভাব। বিরহ ব্যথায় মন তার টন টন করে; সে ভাবে, আহা নিবুর-মা বেঁচে থাকলে সেও আজ দশজনের মত দর্শনে আসতে পারত? মন তার হাওয়ায় চড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দেশের বাড়ীর আনাচে-কানাচে খুঁজে

বেড়ায়, তাকে যার মিষ্টি মুখখানি পঞ্চাশ বছর মশগুল করে রেখেছিল তার মনকে।

একদিন সন্ধ্যা-আরতির দেরী আছে দেখে নিবারণ সবাইকে নিয়ে প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে বসে প্রতীক্ষা করছিল। এই সময় চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ী-পরা আধ-বয়সী এক মহিলাকে যেতে দেখা গেল। শীতের সন্ধ্যা, জমাট ধোঁয়ায় বিজলীর আলো যেন প্রদীপের আলোর মতই নিব-নিব দেখাচ্ছিল। এই আলোআঁধারি পরিবেশের মধ্যে মহিলাকে অকিঞ্চনের কমলা বলে ভুল হল। এই দৃষ্টিভ্রমের জন্যে অকিঞ্চনকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, কারণ মহিলাটির দেহের গড়ন, চলনের ধরণ, অনেকটা তার স্ত্রী কমলারই মত। তা' ছাড়া এই সময় কমলার চিন্তায় মন তার বিভোর থাকায় মনের এই আমেজে সে মহিলাকে কমলা বলে ভুল করে বসল। ছেলে, বউ, নাতি-নাতনী সকলকে চকিত করে' সে চেঁচিয়ে উঠল—কমলা, কমলা দাঁড়াও আমিও আসছি তোমার সঙ্গে। অকিঞ্চন ছুটল মহিলার দিকে। মা-বাপের ইঙ্গিতে কেলো, ভোলা, ফেলী ছুটে গিয়ে পথ আগলায়; তারা নরম গলায় বল্লে—দাদু, দাদু, ও ঠাক-মা নয়। নিবারণ ও মানসী লজ্জা পায়, দুঃখ পায়।

পরের দিন থেকে নিবারণরা অকিঞ্চনকে নিয়ে আর বাইরে বেরোয় না; তারা ভয় পায়, লাল পেড়ে শাড়ীপরা মহিলা দেখে অকিঞ্চন আবার বা কোন্ কাণ্ড বাধিয়ে বসে! অকিঞ্চনের বিষণ্ণ মুখখানি দেখে, কি জানি কেন বাড়ীওয়ালা দ্বিজবর দৈবজ্ঞের গিন্নীর মন টন টন করে। হয়ত চিরন্তনী স্ত্রী-প্রকৃতি—প্রকৃতি-শূন্য পুরুষের জন্যে স্বাভাবিকী দরদ। যে কারণেই হোক, একদিন মানসীকে সে বলে—একি কচ্ছো বউ? দিনরাত

গারদে পুরে রেখে, শোকে জবুথবু শশুরকে মেরে ফেলবে নাকি শেষে? সহুরে এনেচো, দু-দশ জায়গায় নিয়ে যাও, দেখাও-শোনাও, দেখবে দিন দু'তিনেই কেমন চাঙা হয়ে ওঠে।

আবার অকিঞ্চনকে নিয়ে নিবারণরা বেরুতে লাগল। আজ বেলুড়, কাল খড়দহ, পরশু দক্ষিণেশ্বর ঘুরে বেড়াল; কিন্তু অকিঞ্চনের মনে কোনই সুখ নেই, শান্তি নেই দেখে হতাশ হয়ে পড়ে তারা।

একদিন পাড়ার এক তেজ-বরে নিবারণকে বল্‌লে—এক কাজ কর বাবাজি; বাপকে নিয়ে দু'চার দিন থিয়েটার-বায়স্কোপে যেতে পার? দেখবে কি ভেল্‌কি খেলে যায়। থিয়েটার-সিনেমা হোল গিয়ে বাবাজি সকল রোগের রসায়ন; স্বয়ং ধন্বন্তরী এঁদের কাছে কুপোকাৎ। হেঁ! হেঁ!, নিজে ভুক্তভোগী কিনা, রোগের অন্ধি-সন্ধি, ফিকির-ফন্দি সবই শর্ম্মার নখ-দর্পণে!

নিবারণরা তেজ-বরের কথা মাথা পেতে নেয়; তার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। অকিঞ্চনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে তারা অবাক হয়। সে এখন নায়, খায়, ঘুমোয়; কেলো ভোলা ফেলীর সঙ্গে হাসি-মসকরা করে, আর সন্ধ্যা না হতেই ছবি-ঘরে, রঙ-মহলে যাওয়ার জন্যে সাজ-গোজ করে।

বাড়ীওয়ালা দ্বিজবরের ব্যবসা ছিল দৈব-গণনা; পাড়ার লোক, বাড়ীর লোক সকলেই তাকে 'দৈবজ্ঞ ঠাকুর' বলেই ডাকে। একদিন দৈবজ্ঞ গিন্নী দ্বিজবরকে বলে—ওগো শুনচো?

দৈবজ্ঞ প্রশ্ন করে—কি শুনবো?

—বলছিলাম কি, নিবুর বাপের হাতটা একবার দ্যাখো না। খ্যাটিয়ে গিয়ে যে দু'দিনেই মুখে হাসি ফুটেছে!

দৈবজ্ঞ বলে—হাত আর দেখতে হবে না, না দেখেই বলছি—ওর কপালে নতুন বউ নাচচে।

—কি যে বল! অমন ঘাটের মড়াকে নাকি কেউ মেয়ে দেয়?

—দেয় গো দেয়, মড়াকে নয়—তার জ্যান্ত টাকাকড়িকে।

দৈবজ্ঞর দৈববাণীর পাঁচ-সাত দিন পরেই ছিল তার অন্য এক ভাড়াটিয়ার মেয়ের বিয়ে। সকাল থেকেই বাড়ীর রকে রোশন-চৌকি বসেছে। সানাইদার ভৈরবী রাগিণী ভাঁজছে, সুরের আলাপে, বিস্তারে ওস্তাদী থাকলেও সমজদারের অভাবে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শুক্নো কাঠের বাঁশির অন্তর থেকে সুরের ঝরণা-ধারা বের করে আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলছে।

সন্ধ্যার আগে থেকেই রঙ-বেরঙের ফুলের মত শ'য়ে শ'য়ে বিজলি বাতি জ্বলে ওঠে, ঝিমন্ত সানাইদার জীবন্ত হয়ে ওঠে, সুরের অন্তরে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে. পাড়ায় আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। ছোটদের দল ছুটে বেরিয়ে পড়ে পথে, ফুটপাতে, সুরের ঝঙ্কারে, আলোর সমারোহে, মাতিয়ে তোলে তাদের মন। উদ্‌ভ্রান্ত প্রজাপতির মত, তারা নেচে-কুঁদে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পাড়া মাত করে।

রাত আটটায় লগ্ন ; বর আসবে সাতটায়। বাড়ীর লোক যতই ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল, পাড়ার লোকের উৎসাহ-উত্তেজনা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। ছেলেদের হৈ-হল্লা, লোকজনদের চেঁচামেচি, মেয়েদের হাসি-কলরব সারা বাড়ীটাকে একটা বেতালা-বেসুরা হট্টগোলে জমজমে করে তুলেছে। বাড়ীর সকলেই আনন্দ উৎসাহে উৎফুল্ল, শুধু অকিঞ্চনই

নিরানন্দে নিমগ্ন। নাচ-ঘরে, ছবি-ঘরে গিয়ে মনে যে উৎসাহ উল্লাস জেগেছিল সে সব যেন শুকো পাতার মত সানাইয়ের ফুঁয়ে দূরে উড়ে গেছে। সে ভাবে ও-ত সানাইয়ের রাগিণী নয়—কাল-নাগিনী ছোবল মারছে বুকে; ও-ত বিয়ের উৎসব নয়—তারই শ্মশান-যাত্রার সমারোহ! সে শোকে, দুঃখে, আতঙ্কে ঘরের কোণে মুখ গোঁজ করে বসে থাকে।

এই সময় বিয়ে-বাড়ী থেকে কনের মা এসে ডাকেন—বাবা একটিবার আসুন, আপনার নাতনীর বিয়ে, আপনি না এলে কি চলে?

অকিঞ্চন যেন কালা, কিছুই যেন সে শোনেনি এমন একটি ভাব দেখায়, স্তব্ধের মত থাকে।

মা চলে যায়। কনে আসে নিজে কেলো, ভোলা, ফেলীর সঙ্গে। সবাই মিলে অকিঞ্চনের হাত ধরে টানাটানি করে, সবাই একসঙ্গে বলে—এসো দাদু, ঐ শোন শাঁক বাজছে, বর এলো বলে। অকিঞ্চন কি করে; অনিচ্ছায় কলের মানুষের মত তাদের সঙ্গে চলে। ততক্ষণ বরের মোটর এসে গেছে, ঘন ঘন শাঁক বেজে ওঠে। কনে তাড়াতাড়ি ছুটে পালায় তার সঙ্গিনীদের আবেষ্টনীর মধ্যে।

বর নামছে। ঘন ঘন শাঁক বাজছে; রসুনচৌকি সুরের পুর বাজিয়ে চলেছে। বর ও কন্যাযাত্রীদের জামা-কাপড়ের মিষ্টি গন্ধ ঠিকরে পড়ছে। সানাইয়ের তানে, শাঁকের শব্দে, ফুলের গন্ধে, আলোর ঝলকে ঘরটাকে মনে হচ্ছিল যক্ষপুরীর মালঞ্চ।

শীতল বাতাসের স্পর্শে, এসেন্স-স্নো-পাউডারের গন্ধে, রঙিন আলোর ইন্দ্রজালে অকিঞ্চনের মনের জড়তার খোলসটা তখনকার মত খসে পড়ে। মুখে হাসির আমেজ না থাকলেও মনের ঘোরটা ফিকে হয়ে

আসে, একটা নতুন আশার চপল আলো মনের কোণে লুকোচুরি খেলায়।

এই সময় তাজ মাথায়, গরদের ধুতী-পাঞ্জাবী পরণে, সিল্কের উড়নি উড়িয়ে, সোণালী লপেটা পায়, মালা গলায় বর চলে যায় অকিঞ্চনের গা ঘেঁষে-কুমারী—নবোঢ়া বেষ্টিত হয়ে পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। বর অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে টোপর হাতে সুমুখে ঝুঁকে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে সুসজ্জিত আসনে বসে। তখনও তরুণীদল মুঠো মুঠো ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় বরের গায়।

অকিঞ্চনের চিন্তাধারা পঞ্চাশ বছরের আগেকার একটি দিনে গিয়ে পৌঁছোয়, নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে। এ বিয়ে আর সে বিয়ে! ঢাকের কাছে ট্যামটেমি, চাঁদের কাছে জোনাকি!

আজকালকার আধুনিক বিয়ের জমকালো আড়ম্বর, সমারোহে তার মনকে নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তার মাথায় চিন্তার আগুন জ্বলে। সে অলক্ষ্যে নিজের ঘরে যায়।

পরের দিন সকালে মানসী এসে ডাকে—বাবা আসুন, চা-জলখাবার দেওয়া হয়েছে।

—কি বলছো মা বুঝতে পারছিনে।

—চা-জলখাবার খাবেন আসুন।

অকিঞ্চন সখেদে বলে—কেবা দেয়, আর কেবা খায়?

শ্বশুরের কথার হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে' মানসী গিয়ে নিবারণ-কে বলে।

নিবারণ আসে, তাকেও অকিঞ্চন ঐ এক কথাই বলে—কেবা দেয়, কেবা খায়।

তারা সমস্যায় প'ড়ে দ্বিজবরকে ডেকে আনে। তাঁকে ঐ এক উত্তর—কেবা দেয়, কেবা খায়।

দ্বিজবর সহাস্যে বলে—দেবার লোক খোঁজ হচ্ছে, এখন খেতে আসুন।

মাস খানেকের মধ্যে অকিঞ্চনকে খাবার দেবার লোক জোগাড় হল, কিন্তু সানাইও বাজল না, রোশনাইও জ্বললো না, পুষ্প-বৃষ্টিও হল না। তা' না হলেও তার চুপসো মুখে হাসি দেখা দিলে, চোখে খুশির আমেজ জাগল। আর নিবারণ ও মানসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

এই খোশ-খবর তাদের গাঁয়ে গিয়ে যখন পৌছল, তখন সবিস্ময়ে সকলে বললে—হল কি!

# লাখপতি

জলেশ স্বনামেই গাঁয়ে সুপরিচিত। মহেশকে কিন্তু জলেশের বাপ না বললে কেও চিন্‌ত না। মহেশের ছিল যাজন ব্যবসা, পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র দশকর্মান্বিত পণ্ডিত। আগের আমলে গৃহস্থের বাড়ী দশকর্ম ত ছিলই, তা' ছাড়া ফাল্‌তু কাজ—বারো মাসে তেরো পার্বণও ছিল। হালে তেরো পার্বণের এক পার্বণও নেই আর দশকর্মের অনেক কর্মই অচল। থাকার মধ্যে আছে শুধু শ্রাদ্ধ, বিবাহ আর সার্বজনীন পূজা। আগেকার সস্তাগণ্ডার দিনে এই এক তরফা রোজগারে ছোট-খাটো সংসার কোন রকমে চলত, কিন্তু এই মাগ্‌গির বাজারে তা' সম্ভব নয়। আয়-ব্যয়ে গরমিল দেখে মহেশকে ইস্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাজটি নিতে হয়েছে।

আয় বাড়লে, ব্যয়ও বাড়ে, মহেশের সংসারেও ইহার বিপরীত দেখা গেল না। তারা তিনটি প্রাণী—নিজে, স্ত্রী আর জলেশ। তা' হলে কি হয় এক জলেশের পড়া-শোনা সাজ-সজ্জা আর হাত-খরচাতেই মাস মাস কুড়ি টাকা লাগে। জলেশ পর পর তিন বছর ম্যাট্রিক দিলে, কিন্তু একবারও গেজেটে তার নাম বেরল না। ইউনিভার্সিটি যতই তার বিদ্যার বহর চেপে রাখতে চাচ্ছিল সেও ততই জিদ করছিল, ম্যাট্রিক পাশ ত সে করবেই, চাই কি বি-এ, এম-এও। ছেলেকে ক্লাশে অচল দেখে মহেশ পড়েন মহা ফাঁপরে। তিনি নিরুপায় হয়ে হেড-মাষ্টারের দ্বারস্থ হলেন, যদি কোন রকমে

তিনি ক্লাস টেনে জলেশের কায়েমী স্বত্বটা বাতিল করতে পারেন। হেড-মাষ্টারবাবু সবিনয়ে অক্ষমতা জানিয়ে মহেশকে দৈবের ওপর নির্ভর করতে বললেন।

মহেশ তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি জানতেন, গাঁয়ে এমন কোন দুঃসাহসী লোক ছিল না যে, জলেশের বিরুদ্ধে টুঁশব্দটি করতে পারে। তার মনে পড়ে ক্লাস নাইনে জলেশের কীর্তির কথা। ফি বছরই সে অঙ্কে ফেল করছিল, আর ফি বছরই একে-ওকে ধরে বা ভয় দেখিয়ে ক্লাস-প্রমোশানটা বাগিয়ে নিচ্ছিল। সেবার অঙ্কের মাষ্টার গোঁয়ারতুমি করে জলেশের প্রমোশানে রাজী হলেন না। জলেশের ইস্কুল-জীবনে এই প্রথম আঁতে ঘা, ছাত্রদের চোখে অতিকায় জলেশ খর্ব্বকায় হয়ে পড়ল। এ অপমান সে হজম করতে পারলে না, কয়েকদিন পরেই গাঁ-ময় ছড়িয়ে পড়ল জনরব—কে বা কারা নাকি অঙ্কের মাষ্টারের গলায় ছেঁড়া চটির মালা পরিয়ে দিয়েছে।

লোকে বলে—ডানপিটের মরণ আড়শেঁওড়ার ডালে। জলেশের কপালেও ঐ রকমই ঘটল। চার বারের বার ম্যাট্রিক দিতে বসে পাশের একটি ছেলের কষা-অঙ্ক টুকতে গিয়ে গার্ডের হাতে ধরা পড়ে, সে ভয় খায় না, গার্ডকে চুপে চুপে শাসিয়ে ভড়্কে দিতে চায়। ফলে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটল যার জন্যে জলেশকে এক রাত্রি থানাদারের অতিথি হতে হয়েছিল। এর পর নাম ও মান বজায় রেখে গাঁয়ে থাকা জলেশের পক্ষে দায় হল। সে ফুলগাছিতে বাপের এক যজমান বাড়ী পাড়ি দিলে।

তিন-চার মাস পরে যজমানের চিঠি এল মহেশের কাছে। সে লিখছে—জলেশ যাজকের কাজ শিখছে বটে কিন্তু তার ঝোঁক হোমিওপ্যাথির দিকে। বাংলা বই কয়েকখানা কিনে দিয়েছি, কিন্তু পড়ে কি ছাই? আর পড়বেই বা কখন; যত সব অকর্মা ছেলের দল নিয়ে সারা দিনই হৈ-চৈ করে বেড়ায়। ওকে একটা চিঠি লিখলে ভাল হয়।

মহেশ পড়েন আতান্তরে। চিঠি না দিলে যজমানের কাছে মান থাকে না, আর দিলেও জলেশ তার মান রাখবে না। সাত পাঁচ ভেবে শেষে লিখলেন:—

কল্যাণীয়েষু,

জেনে সুখী হলাম তুমি যাজন ও ডাক্তারী দু-ই এক সঙ্গে শিখছ। খুব ভাল কথা। যাজন আমাদের কৌলিক কাজ, ডাক্তারী শিখছ শেখ কিন্তু এই কাজটা একটু ভাল করে শিখতে চেষ্টা করো। আমি বুড়ো হয়েছি, দূরের যজমান-বাড়ী যাওয়া আসা করতে পারি না, তুমি দশকর্মান্বিত হয়ে যজমানদের ভার নিলে জীবনে আমি শান্তি পাই। ইতি—আশীর্ব্বাদক—তোমার বাবা।

জবাবে জলেশ লিখলে:—

কল্যাণীয়েষু,

বাবা, তোমার চিঠি পেলাম। তুমি হয়ত ভুলে গেছ আমি বিশে পা' দিয়েছি। আমি এখন সাবালক, স্বাধীন, তোমার শাসন, তাড়ন ও পালনের বাইরে। তোমাকে খোলাখুলি জানাচ্ছি, যজমান বাড়ী

গিয়ে খোলা কাটতে পিণ্ডি চটকাতে পারব না আমি, আমি ডাক্তারীই করব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—জলেশ।

বড় দুঃখে মহেশ চিঠিখানা জলেশের মাকে শোনালেন। ছেলেরই 'যুগ্যি' মা, প্রসন্ন-মুখে বল্লেন—আহা কি খাশা লিখেছে দ্যাখোতো। ছেলে ত নয়, বিদ্যের জাহাজ! পোড়ারমুখো 'মেষ্টার'গুলো বাছাকে ফেল করে করে পাশ করতে দিলে না। আর তোমাকেও 'ধন্যি'! বাপ হয়ে তাদের দলে মিশে ছেলেটার মাথা খেলে! নাঃ তুমি বাপ ত নও, জলেশের শত্তুর শত্তুর।

মহেশ—কি পাগলের মত বকছো! বিদ্যের জাহাজই বটে! বাপকে লিখেছে—কল্যাণীয়েষু! আশীর্ব্বাদ করতেও কসুর করেনি! একটি আস্ত অকাল-কুষ্মাণ্ড!

জলেশের মা—তা মন্দটা কি লিখেছে? কল্যাণ চাইবে না ত কি বাপের বিপদ আপদ চাইবে? আহা! আজকালকার দিনে অমন ক'টা ছেলে আছে শুনি?

মহেশ স্ত্রী-পুত্রের 'ভুবন বিজয়ী' অজ্ঞতায়, বাচালতায় দারুভূত মুরারী হলেন। তিনি আর কারো বাড়ী যান না, কারো সঙ্গে কথা কন না; শুধু ঘরে বসে বসে 'হা ভগবান, হা ভগবান' করেন আর নিজের মরণ ডাকেন।

এদিকে কুলগাছিতে চুটিয়ে ডাক্তারী করছে জলেশ। 'শতমারী' হতে বেশী দেরী ছিল না তার। ছ'মাসের ডাক্তারী জীবনে ছ'টি রুগী পেয়েছিল সে, চার জনকে বৈতরণী পার করে' বাকী দু'জনকেও

যখন ভব-সাগরের ও-পারে পাঠাবার চেষ্টায় ছিল, সে সময় তার হাত থেকে ছিট্‌কে গিয়ে তারা কব্‌রেজের হাতে পড়ে এবং নিজেদের জীবনদীপের দীপ্তিটুকু বজায় রাখে।

গাঁয়ের লোক চলন্ত এঞ্জিনের মত ফোঁস ফোঁস করছিল, জলেশকে এক হাত দেখে নেবার জন্যে হাত তাদের নিশপিশ করছিল। কথাটা মহেশের যজমানের কানে আসতেই ঐ দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে মেঠো পথে তাকে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিলেন। রুগীদের কাছে কিছু তার পাওনা আছে জানিয়ে জলেশ ট্রেনে উঠে পড়ল। পরের দিন যখন বাড়ী পৌঁছল সে তখন শ্মশানে মহেশের সৎকার হচ্ছিল। পাড়ার প্রবীণরা বলাবলি করছিলেন—মহেশের ভাগ্য ভাল যে অমন চোয়াড়ের হাতে তার মুখাগ্নি হয়নি।

বাপের অভাবে টাকার টানাটানিতে জলেশ চোখে সরষে ফুল দেখে। একদিন মায়ে-ছেলেতে কথা হচ্ছিল—

মা বললেন, টাকার ভাবনা কি তোর। একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর; দেখবি হু হু করে টাকা এসে পড়বে।

জলেশ ভাবে—বিয়ে ত সে করবেই, একটা কি দশটা, সে ত তারই হাতের মুঠোয়। বিয়ে করব বল্‌লেই ত আর বিয়ে করা যায় না, ঘটক চাই, পছন্দ মত মেয়ে চাই, মোটা রকম বর-পণ পাওয়া চাই, তবে না বিয়ে করা যায়! এ সবের সময় কই তার? টাকা চাই তার তড়ি-ঘড়ি।

সে মাকে জিগগেস্ করে, আমাদের শিষ্য-যজমানদের নাম জানো?

—ও মা! আমি মেয়ে মানুষ, সে সব কি জানি? তবে ওঁকে হামেশাই একটা খাতার পাতা উল্টোতে দেখতাম, দেখবি সেটা?

—দাও ত দেখি।

জলেশ ভাবল, হুঁ! ডুবে ডুবে জল খায়, একাদশীর বাপেও টের পায় না। গোপনে কটা বিয়ে করেছে বাবা ঠিক কি? খাতায় হয়ত বিমাতাদের বাপের বাড়ীর হদিস পাওয়া যাবে। মন্দ কি! তাই-ই সই। বিমাতাদের বাড়ী গেলে, বাপের খাতিরে কিছু না-কিছু পাওয়া যাবে।

মা খাতা এনে দিতেই জলেশের নজর পড়ল চৌখালী চৌধুরী-দের বংশ-তালিকায়।

৺রমানাথ চৌধুরী—মৃত্যু ১২৯৮ সন, মাঘের কৃষ্ণা একাদশী।
৺রাধানাথ „ „ ১৩১৮ „ „ „ দ্বাদশী।
৺হরিনাথ „ „ ১৩৩৮ „ „ „ ত্রয়োদশী।
শ্রীরঘুনাথ চৌধুরী—

আনন্দে জলেশের মন নেচে ওঠে। বারবার খাতাখানা বুকে মাথায় ছুঁইয়ে ফিরিয়ে দেয় মাকে। অঙ্কে কাঁচা হলেও হিসাবে জলেশ ছিল পাকা। সে দেখলে কুড়ি বছর পর পরই চৌধুরীদের এক একজন যমের কেরাণীর দেনা-পাওনা মিটাতে গেছে। বর্ত্তমান ১৩৫৮ সনের মাঘ মাসে রঘুনাথের দক্ষিণ দুয়ারী যমের বাড়ী যাওয়ার কথা। হয়ত আগেই চলে গেছেন, কারণ সেদিন ছিল মাঘের সংক্রান্তি। কী সুবর্ণ সুযোগ তার। কী মস্ত দাঁও হাতের নাগালে। নাঃ আর দেরী নয়, তখনি ছুটল সে চৌখালী—তিন ঘণ্টার পথ

দু' ঘণ্টায় পৌঁছাল। গোমস্তার সঙ্গে দেখা হ'তেই সে জিগ্‌গেস করে—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—গোগ্রাম থেকে।

—উদ্দেশ্য?

রঘুনাথ চৌধুরীর শ্রাদ্ধ করানো।

সবিস্ময়ে গোমস্তা বলে—সে কি! জ্যান্ত মানুষের শ্রাদ্ধ?

সবিস্ময়ে জলেশ বলে—সে কি! চৌধুরী মশায় মরেন নি?

জলেশ সতেজে বলে—মিথ্যা কথা। বেঁচে থাকতেই পারেন না; না, কখ্‌খনো পারেন না।

গোমস্তা শ্লেষের সুরে জানতে চায়—কেন পারেন না?

জলেশ—এর কেন-টেন নেই। পারবার কি যো আছে? যার বাপ-ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ কুড়ি বছর পর পর মরেছে সে সুনিয়মটি কি শুধু রঘুনাথের বেলায়ই বদলে যাবে? না মশায়, যমের কেরাণী অত হাবাগবা নয় যে ইচ্ছা করলেই কেউ ধাপ্‌পা দিতে পারে তাকে। এটা ১৩৫৮ সন, আজ মাঘ মাসের সংক্রান্তি। চৌধুরী মশায় হয়ত কবেই মরেছেন; আপনারা কুলপুরোহিতকে ফাঁকি দিচ্ছেন।

গোমস্তা—তুমি কি ৺মহেশ ঠাকুরের ছেলে?

জলেশ—হ্যাঁ, আমারই বাবা ছিলেন তিনি।

—ও, বটে! আচ্ছা বলতে পার ৺হরিনাথ চৌধুরী কোন মাসে স্বর্গারোহণ করেছেন?

—স্বর্গারোহণ করেছেন কি আর কিছু আরোহণ করেছেন তা' বলতে পারি না। তবে তিনি যে ১৩৩৮ সনের মাঘ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মরেছেন তা আমার খাতায় লেখা আছে।

—রাধানাথের মৃত্যু সন বলতে পার?

—বিলক্ষণ। পারি বই কি। ১৩১৮ সনের মাঘ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী।

গোমস্তার ত আক্কেল গুড়ুম! জলেশকে বসতে বলে, সে অন্দরে গেল গিন্নীমাকে জানাতে।

জলেশ বসে বসে ভাবছিল—লোকটা বুঝি গা-ঢাকা দিলে। তা' দিক; পাওনা গণ্ডা আদায় না করে শর্ম্মা গা তুলছে না।

গোমস্তার মুখে জলেশের কথা শুনে গিন্নীমা হাসবেন কি কাঁদবেন দিশা পান না। পাগল নয়ত?—তিনি জিগ্‌গেস করলেন।

গোমস্তা—না মা পাগল নয়, সব ঠিক ঠিকই বলছে।

গিন্নী—তা বলুক্‌গে, ও পাগল নয় ত কি? ভাগ্‌গিশ কর্ত্তা বাড়ী নেই! যাও কিছু দিয়ে এক্ষুণি আপদ বিদেয় করগে। ৺মহেশ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের দরুণ এখনো কিছু পাঠানো হয়নি; খরচটা সেই বাবদেই লিখো।

গোমস্তা দপ্তরে ঢুকে দু'খানা দশ টাকার নোট এনে জলেশকে দিয়ে বললে—এই নাও তোমার বাপের শ্রাদ্ধের পাওনা। এখন ভালয় ভালয় বিদেয় হও।

বৃদ্ধ যজমান পিতারই তুল্য মনে করে' জলেশ ভাবল টাকাটা রঘুনাথের শ্রাদ্ধ বাবদই পেলে সে। খুশি হয়ে জিগ্‌গেস করে,

—খোকাবাবুর নামটি কি?

—জানকীনাথ।

জলেশ—আহা বংশের কী সুন্দর রীতি! সকলের নামই কৃষ্ণ নামের অনুকরণে! বেশ বেশ দীর্ঘজীবী হো'ক। আবার কুড়ি বছর পরে পায়ের ধূলা দোব; কি বলেন?

উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই জলেশ গোগ্রামের পথে পা বাড়াল। উনপঞ্চাশ পবন এসে ভর করলে তার পায়; বাড়ী পৌঁছুতে পোণে দু'ঘন্টাও লাগল না। ঘরণী না থাকায় জননীর হাতেই নোট দু'খানা দিলে। পুত্রের এই প্রথম উপার্জ্জন, মা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করলেন—লাখপতি হও।

# পূজার চাঁদা

সবে আশ্বিনের শুরু; মাসের শেষে পূজা। তখনও আকাশে-বাতাসে বর্ষার জলো ভাবটা তাজা রয়েছে। তখনও দু' এক পসলা হাল্‌কা বৃষ্টি হচ্ছিল; থুথ্‌থুরে বুড়ো-বুড়ীরা, যারা আগমনীর আনন্দের আশায় শুক্নো গাঙের সরু ধারার মত প্রাণের মন্থর-স্পন্দন আঁকড়ে ছিল, তারা ভাবগদগদ হয়ে ভাবলে—না, না, ও বৃষ্টি নয়; গৌরী ও গিরিরাণীর মিলনের পূর্ব্বাভাস—আনন্দ-অশ্রু।

আশ্বিনের শেষ দিকে পূজা হলেও মাসের গোড়া থেকেই কুমোরেরা প্রতিমা গড়বার তোড়জোড় করছে। পাড়ায় পাড়ায় সার্ব্বজনীন পূজার সাড়া পড়েছে। প্রধানরা ঘন ঘন বৈঠক ডাকছেন, পরামর্শ করছেন। ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা বন্ধ করে যাত্রা-থিয়েটারের মহলায় মেতে উঠেছে। বাতে ও বয়সে পঙ্গু পুরুষেরা ঘরে বসে হুঁকো টানছেন আর কার কার কাছে চাঁদা চাইতে হবে তাদের তালিকা লেখাচ্ছেন। গাঁয়ের গিন্নীবান্নীরাও উৎসাহে মেতেছেন; তাঁরা ঘট, কুলো 'চিত্তির' করছেন, তিলকুটো, রসকরা গড়ছেন, নিজেদের শাড়ী-সায়া আর ছেলে-মেয়েদের জামা-জুতো কিন্‌তে এ-দোকান সে-দোকান করে বেড়াচ্ছেন। ছোটদের মনে সার্ব্বজনীন আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে, প্রাণে তাদের দোলা জেগেছে; তারা

দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরছে আর বাহানা করে, বিরক্ত করে, জ্বালাতন করে মোটা অঙ্ক সই করিয়ে নিচ্ছে খাতায়। তারা যেখানে আমল পাচ্ছে না এমন সব জাঁদরেলদের দরবারে ধন্না দিচ্ছেন গিয়ে বুড়োবুড়ীর দল। তারাও যেখানে হার মানছেন সেখানে যাচ্ছেন মা-মেয়ের পল্টন—এ প্রগতির নারায়ণী সেনা।

এ হেন দিগ্বিজয়ী বাহিনীও ফি-বছরই পরাজিত হয়ে আসছে গাঁয়ের অমর মুখুজ্যের কাছে। এবারও এই জয়েচ্ছু পল্টনের ওপর বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্না হন নি। এই বিফলতায় গাঁয়ের লোক রাগে অপমানে আগুন হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠীর দিন সকালে গাঁয়ের মাতব্বররা অমরের বিরুদ্ধে একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্যে সুরেশ চাটুজ্যের বৈঠকখানায় জমায়েত হলেন। এক টিপ নস্য টেনে হলধর বাঁড়ুজ্যে 'তিরিক্কি' মেজাজে বললেন—কাজটা কিন্তু অমর খুবই অন্যায় করছে।

গোপাল ঘোষ—মেয়েরাও ছ্যা ছ্যা করছে।

রাধিকা বোস—তা-ত সব্বাই-ই জানি, এখন কি করে ওকে জব্দ করা যায় ঠিক কর।

সুরেশ—আমিও বরাবরই বলে আসছি ওর ধোপা-নাপিত বন্ধ কর; তোমরা তা শুনছ কই?

হলধর—আমাদের 'কত্তাদের' আমলে 'একঘরে' করাটাই ছিল সমাজের সেরা শাস্তি।

গোপাল—তা-ত ছিল, এখন যে সে-আমলে এ-আমলে অনেকখানি তফাৎ।

রাধিকা—ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে চাও কর; কিন্তু ওতে কিচ্ছুই সাজা হবে না। তিন আনায় সহরে যাওয়া-আসা চলে 'বাসে', সেখানে ধোপা-নাপিতের অভাব কি? যত 'স্যালুন' তত 'ড্রাইং-ক্লিনিং'!

রাধিকার খাঁটি কথায় সকলের যখন 'আক্কেল গুড়ুম' ঠিক তখুনি গাঁয়ের হারু নাপিত এসে হাজির—তার ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি সাপের লেজের মত লিক্‌লিক্ করছে।

হারু ছিল চতুর-চূড়ামণি—অমন আর এক ফন্দিবাজ গাঁয়ের চৌহদ্দির মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার। হারুর চাইতে বয়সে বড় এমন অনেক লোকই ছিলেন; তা' থাকলেও বুদ্ধিতে ছিল সকলেই তার কাছে নাবালক। তাই হারুকে আসতে দেখে সকলের মনই বাসী মুড়ির মত মিয়িয়ে তুবড়ে গেল।

সুরেশ চাটুজ্যে বুকে সাহস আর মুখে হাসি ঢেকে জিগ্‌গেস করলেন—কি হে হারু কোথ্‌থেকে?

হারু—মুখুজ্যে পাড়া থেকে।

হলধর—অমরের সঙ্গে ত তোমার গলাগলি ভাব।

হারু—যতটা মনে করেন ততটা নয়; তবে হ্যাঁ কাছাকাছি বটে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলা করা হত।

সুরেশ—তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

হারু—দেবতাদের 'ছিচরণেই' এলাম। রাম না হতেই রামায়ণ

এর মত শুনছি হুজুররা নাকি অমরকে 'নিমখুন' করবেন। ছাপোষা মানুষ অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা—চাঁদা যদি নাই পারে দিতে।

হলধর—আর আমরা বুঝি রাঁড়া? আমরা চাঁদা দি না?

হারু—আমি হাবা-গবা মানুষ; দোষ ধরবেন না দেবতা। দোষ একা অমরের নয়—আপনাদেরও আছে। চাঁদা আদায়ের কায়দা জানা চাই।

গোপাল—শুনি, কায়দাটা কি?

হারু—দালাল লাগাতে হয়। কি দালালি দেবেন বলুন—পাঁচমিনিটে চাঁদা আদায় করে দিচ্ছি।

রাধিকা—কত চাও?

হারু—যত আদায় করব—তত।

গোপাল—তাতে আমাদের লাভ?

হারু—অমর টিট হবে, সেইটাই আপনাদের লাভ।

সুরেশ—হারু ঠিক বলেছে।

হলধর—বখরাটা—তো অর্ধ, মো অর্ধ হয় না? বখরাটা আধা-আধি করতে পার না?

হারু—আজ্ঞে না; হারু এককথার মানুষ।

সুরেশ—হলধর ভায়া, আর কষাকষি ক'রো না, রাজি হও। আমি কিন্তু রাজি।

হলধর—তা হলে আমিও রাজি।

চাটুজ্যে রাজি হতেই ঘোষ-বোসও রাজি হলেন।

হারু খুশি হয়ে কুটিল হেসে চলে গেল।

হলধর—হারুর মুখের ভাব দেখে বুক কিন্তু ধুকধুক করছে। চাঁদা যদি পারেই আদায় করতে?

সুরেশ—পারেই যদি, কত আর পারবে? বড় জোর দু'চার আনাই পারুক। রোজ দু'এক টিপ তার কাছ থেকে . নস্যি নিলেই এক মাসেই উশুল হয়ে যাবে।

গোপাল—আমাদের কি হবে? আমরা ত নস্যি টানিনে।

রাধিকা—ঘটে বুদ্ধি থাকলে সব কিছুই হতে পারবে। হারুকে দিয়ে একদিন ধারে কামিয়ে নিলেই সুদশুদ্ধু আদায় হবে।

সুরেশ—বলিহারি রাধিকা। আমরাও তাই করব। মৌতাতে দাবিয়ে রাখা কি চারটিখানি কথা। কি বল হে হলধর ভায়া?

হলধরের মুখে রা নেই, হারুকে 'ডবল মার্চ্চ' করে আসতে দেখে তার পিলে চমকে গেল।

হাসতে হাসতে হারু এসে ঢোকে।

সভয়ে সুরেশ জিজ্ঞেসা করেন—এত শীগ্‌গিরই ফিরলে?

হারু—কি করি? কেল্লা যে পাঁচ মিনিটেই ফতে!

রাধিকা—কার কেল্লা ফতে—অমরের না তোমার?

হারু—অমরের হলে কি আর হারুর মুখে হাসি ফুটত?

হলধর—অ্যাঁ, অমর চাঁদা দিলে?

হারু—দিলে বই কি?

গোপাল—ক' আনা ?

হারু—আনা! আনা কি? টাকা বলুন।

সকলে বিস্ময়ে—টাকা! ক' টাকা?

হারু হাতের মুঠো খুলে দুটো টাকা দেখিয়ে বললে—দু' টাকা।

সকলে বিস্ময়ে—দু' টা—কা—আ?

হারু—আজ্ঞে। হঁ্যা—আ।

সুরেশ চাটুজ্যে গম্ভীরভাবে ভারি গলায় জিগ্‌গেস করেন—টাকা দু'টো যে তোমার নয়, তা কি করে বুঝব?

হারু—নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করব?

হলধর—নিজের কোট বজায় রাখতে তাও কেউ করে।

ঘোষ আর বোস ডুবে যেতে-যেতে পায়ে মাটি পায়; তারা ভাবেন এবার হারু ঘায়েল হল।

হারু সে ধাতেরই নয়। সে ট্যাঁক থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে সুরেশ চাটুজ্যের হাতে দিলে। তিনি পকেট থেকে চশমা বের করে পড়লেন—হারুর হাতে দু' টাকা পাঠালাম—অমর!

হলধর—সইটা অমরের ত?

সুরেশ—তাতে কোন ভুল নেই ভায়া।

রাধিকা—টাকা দুটো মেকী নয় ত?

হারুকে অবিশ্বাস করলে আঁতে তার ঘা লাগে না। সে গম্ভীর ভাবে টাকা বাজিয়ে দেখায়।

সুরেশ—হারু, তুমি যে ভানুমতীর ভেলকি দেখালে ! শেষে কিনা আমাদের হেন লোকের মুখও ভোঁতা করলে।

হারু জিভ কেটে জোড়হাত করে বলে—ছি, ও-কথা বলবেন না ! সবই গেরোর ফের। এবার আমার পাওনাটা দিন তাহলে।

শংকটে পড়ে সবাই মুখ চাওয়া চাউয়ি করেন।

গোপাল—কাল এসো।

হারু—তা-ই আসব। অমরের চাঁদাটা জমা করে নিন।

সুরেশ—তা' নিচ্ছি। খোকার কাছে খাতা, সে ফিরে আসুক।

সোজন্যে হারু অজেয়। সকলকে 'পেন্নাম, জানিয়ে সরে পড়ে সে। পরের দিন গেল, তার পরের দিনও যায়; কিন্তু হারুর আর দেখা নেই। এদিকে অমরের দেয়া বলে দু'টাকা জমা হয়ে গেছে চাঁদার খাতায়। এ নিয়ে চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে পড়েন মহা ফাঁপরে। শেষে নিজেদের ভেতরেই চাঁদা তুলে তবিল কমতির দায় থেকে রেহাই পান।

# বাড়ীর খোঁজে

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় কলকাতা ছেড়ে সকলেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত! যাঁদের অর্থপ্রাচুর্য্য ছিল তাঁরা অনেকেই সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মানভূম, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ এমন কি সুদূর লক্ষ্ণৌ, কুমায়ুন, পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবাস-বাসের জন্যে ছুটেছেন। আর যাঁদের অর্থবল ছিল না তাঁরা বাধ্য হয়েই বাংলার পল্লী অঞ্চলকে চঞ্চল করে তুললেন। স্ত্রীর অসুখে মায়ের আদরের মতনই জাপানী-বোমার আশঙ্কায় আজ পল্লী-জননীর দরদ বেড়ে গেছে। দলে দলে লোক দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ম্যালেরিয়া, মছলিম ও মিলিটারি—এই ত্রি-মকার অধ্যুষিত পল্লীগ্রামে ছুটেছে। বাঙ্গালী ভীতু এ-কথা আর বলবার যো নেই।

ব্ল্যাক্-আউটের মহড়া অনেক আগে থেকে চল্‌লেও এতদিন তাকে ব্রাউন-আউট বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ দস্তুর মতন নিষ্প্রদীপ করা হয়েছে তাতে ব্ল্যাক্-আউট নামের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে। পথচারীদের অতি ক্লেশে পা টিপে টিপে পথ চল্‌তে হয়, চিত্ত সদা সশঙ্কিত—কখন না জানি স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী গো মহিষাদি কিংবা আধমাতাল-চালিত ট্যাক্সি, বাস, মটরকার ঘাড়ের ওপর এসে হুড়মুড় করে পড়ে। ভয়ে মন্থরগতি মন্থরতর হয়। আড়ষ্ট দেহমন

আরো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। তাতেও স্বস্তি নেই। এ, আর, পির তীব্র তাড়নায় তাড়িতালোকের ত' কথাই নেই, জোনাকীর জ্যোৎ হ্যারিকেন আলোও অনুজ্জ্বল না করলে ধমকানি খেতে হয়। চলতি জীবনযাত্রার বিশৃঙ্খলায় লোক উদ্বাস্তু হয়ে পঙ্গপালের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে সহর ছেড়ে চলেছে। সহরের জনসমুদ্রে এমন এক-টানা ভাটি প্লেগের বার ছাড়া আর দেখা যায় নি। অজানা আতঙ্কে সকলেরই মন যেন দুরু দুরু করছে।

মৃদুলা তার ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সব দায়-দায়িত্বই যেন তার—বাপ যেন শুধুই ঢাকের বাঁয়া। আমার মটো ছিল ভবভূতির অনুভূতি—"সহসা বিদধীত ক্রিয়াম্"। কাজেই আমার কোন কাজেই ব্যস্ততা ছিল না, কিন্তু মৃদুলা ঠিক আমার বিপরীত। বোমারু বিমানের প্রথম অভিযানের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি সঞ্চয় না করে আমার এক পাও নড়বার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃদুলার অতি ব্যস্ততায় তা সম্ভব হলো না। সহর ছেড়ে যাবার জন্যে তীক্ষ্ণ কথার ধারালো খাঁড়া উঁচিয়ে যতই সে আঘাত করতে চাইছিল আমাকে, আমিও নীরবতার ঢালে ততই আত্মরক্ষা করে চলছিলাম। কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ঢাল-খাঁড়ার অভিনয় শেষ হয়ে গেল—খাঁড়ার ধারে ও ভারে ঢাল টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

একদিন রবিবারের বৈকাল স্বর-মাধুর্য্যে ময়ূরের কেকাধ্বনিকে লজ্জা দিয়ে মৃদুলা গর্জ্জন করে উঠলো—বলি হ্যাঁগা, তোমার আক্কেলটা কি শুনি? আমাদের বোমার পেটে না দিয়ে ছাড়বে না দেখ্ছি।

সহর শুদ্ধ্ লোক পালাচ্ছে, আর তুমি বসে আছ কোন্ সাহসে বল তো!

সহাস্যে বল্‌লাম, "তোমার স্বামী" এই সাহসে। আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলাম। দপ্ করে জ্বলে উঠে বল্‌লে—আর দাঁত ছিরকুটে হাসতে হবে না। বাইরে যাবে কি যাবে না তাই বল!

কি উত্তর দি! মালয়ের অবস্থাবিপর্য্যয়ে নিজেও ভড়কে না গিয়েছিলাম তা নয়। মৃদুলার কাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে অধিকতর নিগ্রহভোগ ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হবে না। সহর ছেড়ে যাওয়ার মতলব ছিল না বলেই এতদিন বাইরে বাড়ীর খোঁজ-খবর করিনি। কাজটা নেহাৎই বেকুবি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তা বলে এখন ছোট্ বলতেই ত' আর ছুটতে পারি না। বাড়ীর খোঁজ করতে হবে ত'। আর বিদুরের ক্ষুদকণা যা কিছু আছে তাও গোছগাছ করে রেখে যেতেও সময় চাই। তাই চতুর সেনাপতি সঙ্কটে পড়ে সুসময়ের আশায় প্রতিপক্ষের ওপর যেমন ছলনা ও কৌশল বিস্তার করে, আমিও অনেকটা সেই ধরণেই মৃদুলাকে বল্‌লাম, যাব না বলছে কে? আগে পাঁজি পুঁথি দেখতে দাও। ঐ অ-দিন অ-ক্ষণে ত আর পা বাড়াতে পারবো না। আমার কথার মধ্যে তার পঞ্জিকা-প্রীতির ইঙ্গিত আছে সন্দেহ করে মৃদুলার ধৈর্য্য তাসের ঘরের মত একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। দমের গদির ওপর হতে একটা ভারী বস্তুর চাপ সরিয়ে নিলে সেটা যেমন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, সেও তেমনি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠলো এবং তারছেঁড়া বাদ্যযন্ত্রের মত ঝঙ্কার দিয়া বললে—দিনক্ষেণ দেখি বলে কি আপৎ-

কালেও দেখতে হবে! লোকে পালাবার সময় পাচ্ছে না—দিন আর ক্ষণে! আমি আর একদিনও থাকছি না। কালই তুফান মেলে ছেলেপুলে নিয়ে কাশী চলে যাব। থাক তুমি তোমার পাঁজিপুঁথি নিয়ে।

তিলার্দ্ধ দেরী না করে চল্লিশ মণ বোঝাই লরীর মতন বাড়ীঘর কাঁপিয়ে মৃদুলা কক্ষান্তরে গেল—রেখে গেল তার কথার ঝাঁজটুকু ঘরময় ছড়িয়ে আমার মনকে দগ্ধ করতে। দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মৃদুলার স্বভাবটা আমার কাছে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট ছিল। তার কথা বনাম কাজে কোন দিনই অসঙ্গতি দেখিনি। হক্ কথার না হলেও সে চিরদিনই এক কথার লোক। কাজেই তার এই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসপূর্ণ চরম বাণীকে শুধু চিত্তবিক্ষোভের ক্ষণিক স্পন্দন মনে করতে পারলাম না। ভয় হলো—কথায় যা শাসিয়ে গেলো কাজেও বুঝি তাই করে বসে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—মৃদুলা আর যাই হোক সে নরমের বাঘ নয়। অথই জলে ডুবে যেতে যেতে পায়ের তলায় মাটি পেলাম। মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হ'ল। তখনি ছুটলাম তা'র সন্ধানে। স্তবে সদা-বিরূপ শনিঠাকুর পর্য্যন্ত তুষ্ট হন, মৃদুলার ত' কথাই নেই। বিনয়বাক্যের বহু বিনিয়োগে ভবিষ্যৎ শান্তির উদ্যোগান্তক একটা সন্ধি স্থাপন করে সেই রাত্রেই থার্ম্মাস ফ্লাস্ক আর স্যুটকেশ সম্বল করে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। বিদায় বেলায় মৃদুলার প্রসন্ন মুখ ও মন্দ-মধুর হাসিটি মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার মত আমার বিষন্ন মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দ ঢেলে দিয়েছিল। তার ওপর পথে বাহন পেয়েছিলাম ট্যাক্সি—।

মনে হল একটা দমকা হাওয়ায় চেপে হাওড়ায় এসে হাজির হলাম।

ষ্টেশনের অবস্থা দেখে চক্ষু ত' আমার ছানাবড়া। কী জনতা আর কী হট্টগোল! এ কি ষ্টেশন, না ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্র। কুরুসৈন্য দর্শনে উত্তর গো-গৃহে বিরাট-নন্দন উত্তরের মত দশা হলো আমার। তৃতীয় পাণ্ডবের সাহায্য না পেলেও ঘণ্টা-খানেকের অক্লান্ত চেষ্টায় একখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনতে পেরে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল।

আমার ট্রেণ ছাড়তে বিলম্ব ছিল। তখনও পুরী এক্সপ্রেস ও দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়েনি। এ-দু'টী গাড়ীর যাত্রীদের অবস্থা দেখে নিজের অবস্থা কি হবে সে চিন্তায় বুকটা কেঁপে উঠলো। দু'টী গাড়ীতেই লোক ঠাসা—তিল ধারণের যায়গাটুকুও ছিল না। প্ল্যাটফরমের ওপর বিরাট জনতা—এ যেন এক বিরাট মধুচক্র দৃঢ়সংবদ্ধ, গুঞ্জনরত ও তরঙ্গায়িত। অষ্টপাশী কলকাতার বিরাট বাহুবেষ্টনের মোহ-পাশ হতে মুক্ত হয়ে চাকুরী, মজুরী, মিস্ত্রিগিরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে উড়িয়া, বাঙ্গালী, বেহারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবীরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করে অসংখ্য গাঁঠরি বোঁচ্কা মোট-বিড়ার বিরাট বহর সঙ্গে নিয়ে মহা-কোলাহলে কোন আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতে যেন চলেছে। যথাসময়ে যথেষ্ট পরে দু'টি ট্রেণই পর পর ছেড়ে গেলো। স্থানাভাবে বহু লোক উঠতে না পেরে পরবর্ত্তী স্পেশাল-এর প্রত্যাশায় প্ল্যাটফরমে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

আমার গাড়ী প্ল্যাটফরমে আসবার তখনও সময় হয় নি। তা হলে কি হয়, কম্পমান দেহে ও সশঙ্কচিত্তে চেয়ে দেখলাম প্রবেশপথের মুখে এক বিশাল লোকারণ্য, তাদের মধ্যে অনবরত ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি,

হাতাহাতি, গালাগালি চলেছে—উচ্চ-নীচ শ্রেণীর মধ্যে বাছ-বিচার নেই—স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নেই—কে কার আগে ঢুকবে তা নিয়েই হট্ট-গোল। এ-দিকে দ্বারী মহাশয় গাড়ী প্ল্যাটফরমে না আসলে কাউকে ছাড়ছেন না—জয়দ্রথের মত প্রবেশপথে পরাক্রম প্রকাশ করছেন। করলে কি হবে বুদ্ধিমান যাত্রীদের মধ্যে কেও কেও এক অমোঘ উপায়ে পাশ কাটিয়ে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করছিল। এতে জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, কিন্তু তাতে আসে যায় কি? আমিও বেগতিক দেখে মহাজনদের পথই অনুসরণ করলাম। অবশ্য নিজের কাছেই বড় সঙ্কোচ বোধ হলো। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম আমার মত যারা সুধীজনবিবেচ্য সদুপায়ের সদ্ব্যবহার করে আগে প্ল্যাটফরম প্রবেশ করছেন তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মত আমি সেই জনসমুদ্রে মিশে গেলাম। সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেলো। দু কান-কাটার মত স্বচ্ছন্দচিত্তে আমি প্ল্যাটফরমে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম আমাদের গাড়ীখানা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে আসছে। বাইরে যাত্রিদের চীৎকার ও ধাক্কাধাক্কি ক্রমেই বেড়ে চলছিল। দ্বারী হঠাৎ দ্বার ছেড়ে দিলেন। জনসমুদ্র জোয়ারের বানের মত ঢেউ তুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। হঠাৎ প্ল্যাটফরমে হুটোপাটি ও ছুটোছুটি পড়ে গেলো। যাঁরা আগে ঢুকেছিলেন এবং যাঁরা পরে ঢুকেছিলেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই উল্লঙ্ঘন-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। গাড়ীখানা তখনও স্থির হয়ে দাঁড়ায়নি। এরি মধ্যে যে যাকে পারছে ডিঙ্গিয়ে ঠেলে ঠলে কনুয়ের গুঁতোয় কার্

করে জানালা গলে কামরায় ঢুকে পড়ছে। যাঁরা বেশী চালাক, তাঁরা কিছু কিছু মাল-পত্রও তুলে ফেলছিলেন। এই নর-বানর মনোবৃত্তি দেখে জীবশ্রেণীর উৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ চার্লস ডারউইনের বৈজ্ঞানিক বাণী মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই জ্বলে উঠে নিবে গেলো। যুবকদের ত কথাই নেই, আধবুড়াদের সে কি উল্লম্ফন উৎসাহ। এঁরাই আবার অন্য সময়ে একটু জোরে হাই তুললে বা হাঁচ্লে বুক-ধড়ফড়ানি, কোমব-কনকনানির জন্যে ক্যাকটিনা পিল ও ওরিয়েন্টাল বামের শরণ নিয়ে থাকেন। কিন্তু বিছানা বা ঐ রকমই যা হোক একটা কিছু বিছিয়ে দু'জনের জায়গা এক জনে দখল করবার সময় এঁদের মাংসপেশী সহসা অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আমার মত যাঁরা বেকুব, তাঁরা বুদ্ধিমান্ যাত্রীদের কাছে একটু বসবার জায়গার জন্যে কৃপাপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেও বা দয়া করে একটু নড়ে চড়ে বসবার ভাণ করে, জায়গা দিলাম এরূপ ভাব দেখিয়ে সহযাত্রীর কর্ত্তব্য শেষ করলেন। আর কেও বা সত্য সত্যই একটু সরে বসে, মালপত্র একটু টেনে টুনে কিংবা সু-লম্বিত শ্রীচরণযুগল একটু সঙ্কুচিত করে কোন রকমে একটু জায়গা করে দিয়ে অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ও করলেন। অনেকেই স্থানাভাবে মালপত্রের ওপর বসে কিংবা স্রেফ দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এমন কি কয়েকজন মহিলাকেও এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হলো। তাঁদের মধ্যে একজন আবার সবৎসা ছিলেন। ট্রামে ও বাসে স্থানাভাবে একটি ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে যাঁরা 'উঠুন, উঠুন" "মহিলাকে বসতে দিন" বলে পক্ককেশ

বৃদ্ধদের পর্য্যন্ত আসনভ্রষ্ট করেন, তাঁরাই আবার ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করে মেয়েদের ও মায়েদের অসুবিধা দেখেও দেখেন না।

গাড়ী ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়তেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। কয়েকজন বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি হঠাৎ হুড়মুড় করে নেমে গেলেন ট্রেণ থেকে। পাশের ভদ্রলোকেরাও বেশ হাত-পা ছড়িয়ে সদ্যশূন্য স্থান দখল করে বসলেন। ব্যাপার বুঝতে বেশী বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন হলো না। যাঁরা নেমে গেলেন তাঁরা সকলেই প্ল্যাটফরম টিকেটের দৌলতে অনেক সাঁচ্চা যাত্রীর অসুবিধা করে নিজ নিজ আত্মীয়-বন্ধুদের সুবিধে করে দিয়ে গেলেন। আসল যাত্রীদেব চেয়ে এই দরদী বন্ধুদের ঝাঁজ আরও বেশী।

বিরাট হট্টগোল। বহু হর্ষ-বিষাদের মধ্যে ট্রেণ ছেড়ে দিলে। এবারও স্থানাভাবে বহুলোক পড়ে রইল। কিন্তু যাদের প্রতি ভাগ্যদেবী হেসেছিলেন তাদের একজনের মুখ থেকেও পরিত্যক্ত যাত্রীদের দুঃখদুর্দ্দশার জন্যে ক্ষুদ্র একটা "আহা" শব্দও বেরুল না। কি করে বেরুবে? দেখবার কি সময় ছিল কারো, পুরুষদের বেশীর ভাগই নিজেদের গাঁঠরী, বোঁচকা, বিছানাপত্র, বাক্সপেঁটরা, ছাতি-লাঠি, হ্যারিকেন ইত্যাদি গোণাগুণি করছিলেন। সুবিধামত জায়গায় রাখবার জন্যে অপরের মালপত্র টানাটানি ঠেলাঠেলি করছিলেন। ফলে অনেকের মধ্যেই বকাবকি না হলেও কথা-কাটাকাটি বেশ হচ্ছিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকের সাথেই একটি করে ছোট সুটকেশ, এত অসুবিধার মধ্যেও সেটি হাতছাড়া করে আরামে বসতে বা দাঁড়াতে রাজী নয়। কারো কারো হাতে পানের ডিবা, তার মধ্যে আবার

wheel within wheelsএর মত ছোট কৌটা—জর্দা, দোক্তা, গুণ্ডীর গুদাম। গাড়ী ছেড়ে দিতেই তাঁদের মুখ খুলে গেলো—দোক্তা পানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীদের নিজ নিজ বাড়ীর শ্রীমানদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা বচসা চলছিল—তর্জ্জন গর্জ্জন অশ্রু-বিসর্জ্জনও না ছিল তা নয়। সাধারণের ব্যবহার্য্য যানে প্রকাশ্যভাবে একদিকে যেমন ঘর-গৃহস্থালীর অভাব অভিযোগ মান অভিমানের সবাক চিত্রের অভিনয় চলছিল, আবার অপরদিকে একশ্রেণীর অতি-ভাষণপ্রিয় আরোহীরা পরস্পরের মধ্যে আলাপের আসর জমিয়ে জিহ্বার জড়তা ভেঙ্গে বাক্যবাগীশত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। তাঁরাই আলাপ করতে বেশী ব্যস্ত, যাঁরা আরামে শুয়ে বসে যাচ্ছিলেন। ঘুমের দফা সকলেরই রফা—কাজেই পান বিড়ি সিগার সিগারেট নস্য প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুসমূহের হরদম শ্রাদ্ধ চলছিল। একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ রসালাপশক্তির পরিচয় দেবার জন্যেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মশায় এই সন্ন্যাসী বেশে কোথায় চলেছেন? আমি বললাম—মধুপুরে। বৃদ্ধটি অধিকতর রসিকতার অভিপ্রায়ে পুনরায় মুখ খুললেন—মধুপুর। এই লোটা কম্বল হাতে? আমি উত্তর দেবার আগেই অপর বেঞ্চি হতে একটি আকারে নবীন প্রকারে প্রবীণ যুবক গোপাল ভাঁড়ের বিখ্যাত দাতন গাছটির মতন একটি চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বলে উঠলেন—লোটা কম্বলই বা কোথায় আর সন্ন্যাসীর বেশই বা কোথায় দেখলেন?

বৃদ্ধ মুখের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে হাসির রেখা টেনে, বাঁধান হলেও মার্জ্জনাভাবে বাদামি রঙ্গের দন্তরাজি বের করে বল্লেন—আগেকার আমলের লোটা-কম্বল আর আধুনিক সুটকেশ ও ফ্লাস্ক-এর

মধ্যে কাজে কিছুই প্রভেদ নেই, যা প্রভেদ ঐ নামেই।

ইঁচড়েপক্ক যুবক দমবার নয়, সে বললে—বেশ মশাই, তাই না হয় যেন হলো, কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ দেখলেন কোথায়?

পরিণতপক্ক বৃদ্ধও হট্‌বার পাত্র নন। হাসতে হাসতে বললেন —সে কি! এঁর সন্ন্যাসীর বেশ নয়? ইনিই সত্যিকারের সন্ন্যাসী। যাঁর সঙ্গে স্থাবর-জঙ্গম কোন লগেজ নেই—যিনি রিক্তবন্ধন, তিনি যদি সন্ন্যাসী নন, তবে কি আপনি আর আমি সন্ন্যাসী—যাদের সঙ্গে সচল অচল দু'রকম লট-বহরই রয়েছে। বৃদ্ধটির বাঁপাশে আধখানা ঘোমটা টেনে একটি কৃশাঙ্গী বৃদ্ধা ঈষৎ হাসছিলেন দেখে সকলেই তাঁকে বৃদ্ধের জঙ্গম লগেজ বুঝতে পেরে সশব্দে হেসে উঠলেন। যুবক এতে আরো উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি যদি সন্ন্যাসী, গেরুয়া কোথায়?

বৃদ্ধ বললেন,—শ্বেতাঙ্গশাসিত দেশ কি না, তাই গেরুয়া অচল হয়ে আসছে—গৃহী সন্ন্যাসীদের ত' কথাই নেই, ভেকধারীদের মধ্যেও অনেকে সাদারই ভক্ত।

অকালপক্ক যুবক বৃদ্ধকে বাগে পেলে মনে করে সোৎসাহে বলে উঠলো—গৃহী-সন্ন্যাসী আবার কি মশাই? এ ত কখ্‌খনো শুনিনি। একি কাঁটালের আমসত্ত।

---বয়স ত বেশী নয়, আর এরই মধ্যে যখন চশমা পরেছেন দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয় দুর্ব্বল। আরো কিছুদিন গেলেই বুঝতে পারবেন কাঁঠালের আমসত্ত সংসারে না থাকলেও গৃহী-সন্ন্যাসী বহু আছেন।

সকলে হেসে উঠে হাততালি দিয়ে বৃদ্ধের রসিকতাকে সরস করে তুলতেই ইঁচড়েপাকা আসর জমাতে গিয়ে "ফেল" করলে। আর টুপ্‌টুপে পাকা বুড় শির-পড়ুয়ারই মতো ট্রেণের এই বারো-ইয়ারী ক্লাসে প্রাধান্যের মৌরসী পাট্টা পেলেন। তিনি পরিতৃপ্তের ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন—যাচ্ছেন ত মধুপুর। কিন্তু উদ্দেশ্য?

বাড়ীর খোঁজে।

আমার উদ্দেশ্য শুনে সকলেই যেন অবাক্ হয়ে গেলেন। কামরায় মধুপুরযাত্রীও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা সমস্বরে জানিয়ে দিলেন, কোন বাড়ীই খালি নেই সেখানে। হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম – গিরিডিতে আছে কি? তথাকার যাত্রীরাও 'নেতিবাচক' উত্তর দিয়ে দমিয়ে দিলেন। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বল্‌লেন, মিহিজাম হ'তে ঝাঁঝার মধ্যে কোথাও একটি বাড়ীও খালি নেই। মধুপুরের যাত্রীদের মধ্যে একজন স্বয়মিচ্ছু হয়ে বললেন, দেওঘর পাণ্ডাপাড়ায় খোঁজ করলে এখন হয়ত দু'একখানা ঘর পেতে পারেন, বিলম্বে তাও পাবেন না। অনেকেই এঁর কথায় সায় দিলেন। আমিও মধুপুরের পরিবর্ত্তে দেওঘরে যাওয়াই স্থির করলাম।

ট্রেণ দু'ঘণ্টার ওপর লেট্ ছিল। যশিডিতে গাড়ী বদলে প্রায় ১১টায় দেওঘরে নামলাম। অসময় হ'লেও পাণ্ডার অভাব ছিল না। সকলেই এক নিঃশ্বাসে বাড়ী-ঘর, গ্রাম জেলা, ইষ্টগোত্র সকলের নাম জানতে চাইলো। জেলা ও গ্রামের নাম বলতেই একজন হৃষ্টপুষ্ট পাণ্ডা —পেটটি যেন পাঞ্চিং বল—আমাদের গ্রামের একজন ভট্‌চাজের নাম

করতেই সংক্ষেপে পাণ্ডাপর্ব্ব শেষ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা হলে'ও আমি বললাম, ভট্চাজ মশায় আমার দাদা হন। এতে অন্যান্য পাণ্ডারা স'রে পড়ল। আমি পুষ্ট পাণ্ডার হেপাজতে শিবগঙ্গার পাড়ে এক গলির মধ্যে পাঁণ্ডার বাড়ীতে এসে উঠলাম।

দোতালা বাড়ী অনেকগুলি ঘর এবং বেশ বড় বড়। প্রশস্ত ও লম্বা উঠানের এক পাশে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির সম্মুখেই মস্তবড ইন্দারা—পশ্চিমদেশীয় কোন এক পুণ্যশীলার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত। আর একপাশে একখানা টিনের চালা; তার একধারে অনেকগুলি পাতা-উনান যাত্রীদের রান্নাবান্নার জন্যে। আর একধারে চাকরের মারফতে চালিত পাণ্ডার দোকান। এখানে হাঁড়িপাতিল, চেলাকাঠ ইত্যাদি যাত্রীদের অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। আমি ঘর দখল ক'রে পাণ্ডাকে পয়সা দিতেই চাকরে মাটির একটা ঘট ও এক কলসী জল দিয়ে গেল। আমি প্রাতঃকালীন কৃত্যাদি অন্তে ঘরে এসে দেখি, আমার সন্ন্যাসীর অবস্থা দেখেই হয়ত পাণ্ডাঠাকুর একটা সতরঞ্চ ও বালিশ এনে বিশ্রামেব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করলেন—বাবুজি! শিবগঙ্গামে আস্নান হবে তো? পূর্ব্বেই শিবগঙ্গার দর্শন সৌভগ্য হয়েছিল—তাই বললাম 'না'।

তা বেশ, মার্জ্জন আস্নান ক'রেই বাবাকে দর্শন করবেন। পূজা না হয় কালই দিবেন। পাণ্ডাকে বুঝিয়ে বললাম—পূজা ও দর্শন দুইই কাল হবে। খিধে পেয়েছে বড্ড—এখন অগৌণে ডাল ভাতের যোগাড় চাই। হবে ত?

টাকায় বাবুজি শেরকা দুধভি মিলে—আর ডাল-ভাত মিলবে না—ব'লে পাণ্ডাজী হেসে হাত পাতলেন। একটি টাকা দিতেই পাণ্ডা চ'লে গেলেন। পাণ্ডার হাতে একটি টাকা দিয়ে আমি ইন্দারা-তলায় স্নানার্থী হ'লাম। কিন্তু হ'লে কি হয়। স্নানের কোন সুবিধা দেখলাম না। বাড়ীটিতে অস্থায়ী বহু লোক। স্নানের জন্যে ঐ একটি ইন্দারাই সকলের সম্বল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্নান করছিল, কারো চোখেই লজ্জার পর্দ্দা ছিল না। বুড়া-বুড়ীরাই দেখলাম বেশী বেহায়া—তাদের ধারণা, লজ্জাটা যৌবনেরই ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্যে তা সাপের খোলসেরই মত অকেজো। কোন রকমে স্নান সেরে ওপরে গিয়ে পাণ্ডার প্রেরিত পেঁড়া আর দহিবড়ার সদ্ব্যবহার করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টা-খানেক বাদে পাণ্ডার লোক ডাল, ভাত, ভাজি ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলো—খাদ্যের চেহারা দেখে খেতে আর ইচ্ছা হলো না। কিন্তু পেটে যে জঠরাগ্নি জ্বলছিল, তাতে না বসেও পারলাম না। খেয়ে কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেলো—অতি উপাদেয় রান্না। অনেকেই হয়ত hunger is the best sauce বলবেন। আমার আপত্তি নেই—আহারে তৃপ্তি পেয়েছি যথেষ্ট।

বিকালে পাণ্ডা একটা টাঙ্গা নিয়ে আসতেই বাড়ীর খোঁজে ছুটলাম। কার্সটেয়ার টাউন, উইলিয়ম্ টাউন, বম্পাস টাউন, বেলাবাগান, পুরান্দা, নন্দনপাহাড়ের তল্লাট সবই তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটিও খালি বাড়ী পেলাম না। বাসায় ফিরতে রাত হ'ল ঢের। বাজারের পুরী তরকারী ও পাণ্ডার দেওয়া পেঁড়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে শুয়ে পড়া গেল।

দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুম হ'ল না—ভোর ভোর থাকতে উঠে হাত, মুখ ধুয়ে প্রাতভ্রমণে বের হলাম। বেড়ান ও বাড়ীর খোঁজ করা এই দুই উদ্দেশ্যই ছিল। শিবগঙ্গার পশ্চিম পার দিয়ে শ্মশান বাঁয়ে করে চলে হংসকূপ সম্মুখে রেখে ডাইনে ভেঙ্গে বিলাসী টাউনে এসে হাজির হলাম। তখন উষা ও অরুণ দুয়ের অবসান ঘটেছে—তরুণ তপন দেখা দিয়েছেন। দুই পাশে প্রত্যেক বাড়ীর দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চলেছি, যদি একখানি খালি বাড়ী পাই। কিন্তু কোন বাড়ীই লোকশূন্য কি "To Let" আঁটা দেখলাম না। মন ভারি দমে গেল—মৃদুলার গঞ্জনার ভয়ে আর নিজের দূরদৃষ্টি ও বিবেচনার অভাবে। হাঁটতে হাঁটতে শিবগঙ্গার পূর্ব্বপারে এসে পড়েছি, সম্মুখেই একখানা চায়ের দোকান। লোক জমেছে দেখে আমিও এক পেয়ালার লোভে নড়বড়ে একটি বেঞ্চির এক প্রান্ত দখল করে বসলাম।

তখনও তৈরী হয়নি চা। চা-খোরেরা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, তারা আফিংখোরের গুরুভাই! গল্প-গুজব করা আর বাদশা-উজীর মারাই তাদের স্বভাব। এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রমই দেখলাম। একজন বক্তা, বাকী সবই মুগ্ধ শ্রোতা, শ্রীশ্রীচণ্ডীর আলোচনা হচ্ছিল। বক্তা একজন হৃষ্টপুষ্ট সদাসহাস্যবদন দীর্ঘশিখাযুক্ত মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণ। দেখলাম চণ্ডীখানা বেশ পড়া আছে এবং বাক্-পটুতাও আছে। বক্তা আমাকে বসতে দেখে, একজন নূতন শ্রোতা পেয়ে যেন নূতন উৎসাহের সঙ্গে বলে চললেন—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মহিষাসুর বলে সত্যই কোন অসুর ছিল না। শব্দটি হচ্ছে রূপক

এবং মহিষাসুরের অনুকল্প। আমরা মানুষ মাত্রই এক একটি মহিষাসুর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের সমষ্টি। এই ভাব-সমষ্টিকেই আবার আধারবস্তু হ'তে আধেয় রূপে পৃথক করে দেখবার ও বোঝাবার জন্যে রক্তবীজ নাম দেওয়া হয়েছে। কারণ, রক্তে এদের জন্ম, পুষ্টি ও অস্তিত্ব। এদের রক্তের মধ্যে সহস্র সহস্র কাম ক্রোধাদি আসুরিক সত্তা রয়েছে—সুপ্ত বা অপ্রকট নয়—পূর্ণ-জাগ্রত ও পূর্ণ-প্রকট। তাই রূপক-ছলে বল্‌ছেন—একবিন্দু রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র সহস্র রক্তবীজের জন্ম। আর চণ্ড ও মুণ্ড বলে আপনারা যাদের জানেন, তারা আমাদের অহংজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহেবেরা যাকে Egoism বলেন—চণ্ড ও মুণ্ড হচ্ছে তারই প্রতীক্।

কাম ক্রোধাদিরই মত অহংজ্ঞানের জন্ম, বৃদ্ধি এবং স্থিতিও আমাদের মর্ম্মে অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে। মহাশক্তি-রূপিণী, কালী-করালবদনী, খাণ্ডখর্পর-প্রহরণধারিণী মা অসুরের যেখানে সেখানে আঘাত না করে কাম-ক্রোধ-অহংভাবাদির উৎপত্তিস্থল বুকে আঘাত করে বিনাশ করলেন। বেশ করে ভেবে দেখুন, এই অস্ত্র ও অস্ত্রাঘাত দুই-ই রূপক। অসি জ্ঞানের প্রতীক আর আঘাত জাগরণের প্রতীক। মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়ে মা সমস্ত কাম ও কামনার বিনাশ করে দিলেন। অজ্ঞানের রাজ্যেই অসুরের বাস—জ্ঞানের রাজ্যে তার অস্তিত্ব নেই।

চণ্ডীতত্ত্বের এইপ্রকার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্ম ও

জ্ঞানের উন্নতিবিধায়ক উপদেশামৃত পান হয়ত আরো অনেকক্ষণ চলতো, কিন্তু চায়ের শুভাগমনে বক্তার চৈতন্য ফিরে এলো। বক্তা সর্ব্বাগ্রে হাত বাড়িয়ে এক কাপ গ্রহণ করলেন, অমৃতের লোভে দেবতাদের সমুদ্রমন্থনের মত চামচের সাহায্যে চায়ের সমুদ্রে তরঙ্গ তুলতে তুলতে তিনি বললেন—দেখুন, এ-সব অতি দুরূহ তত্ত্ব, এক কথায় বোঝান যায় না—সময় সুযোগ-সাপেক্ষ। চণ্ডী সকলেই পড়ে কিন্তু বোঝে ক'জনে।

সকলেই বক্তার পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বাক্‌পটুতা এমন কি তাঁর প্রচ্ছন্ন ঐশ-শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে চা-পান করতে লাগলেন। আমিও এক কাপ নিলাম। পান ত' দূরের কথা, চায়ের গন্ধেই আমার বুদ্ধি খুলে গেলো। মনে হ'ল বাড়ীর সন্ধান যদি কেও দিতে পারেন তবে এই চা-মজলিসের মেম্বরগণ। জিজ্ঞাসা মাত্রেই স্বয়ং বক্তা মহাশয়ই বলে উঠলেন—বিলক্ষণ বাড়ীর অভাব কি? আমারই একটি বাড়ী খালি আছে।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বল্‌লাম—একবার দেখতে পারি কি?

বিলক্ষণ, কেন পারবেন না। চা-টা শেষ করে চলুন, এখুনি দেখাচ্ছি।

ভাড়ার একটা আঁচ যদি আমাকে—কথাটা আমাকে আর শেষ করতে হলো না।

বিলক্ষণ, ভাড়ার কথাই ত আগে হওয়া উচিত—বিশেষতঃ আজ-

কালকার বাজারে। দেখছেন ত দশ টাকার বাড়ী চল্লিশ টাকায়ও পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বাড়ীটা কোন দিনই খালি পড়ে থাকে না—কোন না কোন বন্ধু-বান্ধব স্বেচ্ছায় দখল করলে—ভাড়ার কোন কথাই উঠ্‌ত না। দশ পনের টাকা যে যা দিতেন হাসিমুখে হাত পেতে নিতাম। এবার সকলেই বাড়ীর জন্যে লিখলেন—বাড়ী ত কুল্যে একখানি কিন্তু চিঠি এল একশ' খানা। সকলের আব্দার রক্ষা করা ত সম্ভব নয়, তাই তাঁদের নিরস্ত করার জন্যে বাড়ী-ভাড়া দশ টাকার স্থলে আশী টাকা ধার্য্য করেছি। বাড়ি দেখে অপছন্দ হবে না—ছোট হলেও বেশ ছবিটির মত সাজান-গোছান—বড় রাস্তার ওপর। ফলফুলও যথেষ্ট হয়। হ্যাঁ, একটা কথা—আমার ঠাকুরসেবা আছে।—এই জন্যেই ফলফুলের ব্যবস্থা। যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে ধর্ম্মসুধা পান কচ্ছিলেন, আপনি কি আর ঠাকুরসেবায় না দিয়ে নিজে ব্যবহার করবেন সে সব। না, মশায়, সে ভয় আমার নেই।

বাড়ীটি দেখে ত আমার চক্ষু স্থির। যতদূর ছোট ও জীর্ণ হতে হয় তাই। বহু ব্যয়সাধ্য অঙ্গরাগ না করে এ বাড়ীতে মৃদুলাকে এনে ওঠালে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে। দ্বিতীয় বাড়ীর অভাবে অপছন্দ করার যো নেই। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়ার মত এ ক্ষেত্রেও পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন উঠল না, ভাড়ার বৈধতা অবৈধতার কথাও উঠল না। যা হোক, এই দুর্দ্দিনে একটা বাড়ী যে পেলাম, এই পরম লাভ। বাড়ীর সংস্কার করে নিতে পারলে অন্ততঃ মাথা গুঁজতে পারা যাবে—সে কাজটা নিজ ব্যয়ে করে নিতে

হবে। কিন্তু বাড়ীর চেয়ে বাড়ীর মালিককে বেশী ভয়। আমার সামান্য বুদ্ধির কষ্টিপাথরে কষে যতদূর বুঝলাম তাতে তাঁকে কাট-খোট্টা বলেই ভয় হলো। আগে তাঁকে সংস্কার বা সৎকার করতে না পারলে আমার মাথা সুস্থ রাখতে পারব কিনা সন্দেহ। ভাড়া-বাড়ীর পাশেই তাঁর বাড়ী। যদি তিনি দয়া করে যখন-তখন পায়ের ধুলো দেন আর ততোধিক দয়া করে চণ্ডীর ব্যাখ্যা করেন, তবেই ত গেছি। এক ভরসা—মৃদুলা দেবীর মৃদু ভাষণ। একবার তাঁর মধুরালাপে রসাস্বাদন করলে বক্তা মহাশয় হয়ত "শতহস্তেন বাজিবৎ" আমাদের সান্নিধ্য পরিহার করে চলবেন।

আপনারা শুনে খুসী হবেন—পরে কার্য্যতঃ তা সত্যে পরিণত হয়েছিল। মৃদুলার রণচণ্ডী দাপটে বেচারা বাড়ীওয়ালাকে মহিষাসুরের মতই নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর চণ্ডীতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন নি।

# পঞ্চানন্দের বৈঠক

চিরকালই যে কথাটা অখণ্ডনীয় সত্য আজই বা তাহা অসত্য হইতে যাইবে কেন? সভা, সমিতি, বৈঠক ইত্যাদি করিয়া পাঁচমিশালী সংঘগুলি পাঁচজনের চেষ্টায়ই গড়িয়া উঠে, পাঁচজনের উৎসাহ-আনন্দেই জাঁকিয়া আসর জমায়। আবার যেদিন বৈঠকের উপর বিধাতা বিরূপ হন, সেদিন পাঁচজনেরই মতামতের ঠোকাঠুকিতে তাহার অন্তর্জলী হয়।

একদিন আমাদের সহরের পাঁচের পল্লীর পাঁচজন পত্নীহীন প্রাচীনের চেষ্টা-উদ্যোগে যে বৈঠকটির জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইল, পল্লী-জোয়ানেরা পরিহাস-প্রবণতায় তাহার নামকরণ করিল, "কেওড়াতলা ক্লাব"। আর এই নামে আতঙ্কিত হইয়া শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধরা নাম রাখিলেন—"পঞ্চানন্দের বৈঠক"।

এই "পঞ্চানন্দের বৈঠক" সঠিক পাঁচজনেরই বৈঠক। আঙ্গুলে গুণিয়া যে পাঁচজন "অবসরপ্রাপ্ত" বিপত্নীক বৈঠকের সভ্য হইলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত বৈঠকেই আড্ডা জমাইয়া নিত্য নিত্য বাদশা-উজির মারিতেন। ইহার অতিরিক্ত যাহা করিতেন তাহাও পরে বলিতেছি।

বৈঠকের পাঁচজন সভ্যই যে স্ত্রীর জোয়াল মুক্ত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যুবকদের ত কথাই নাই, বৃদ্ধরাও বিপত্নীক হইলে কন্যাদায়গ্রস্ত মাতৃবাহিনীর শ্যেন দৃষ্টি (শনির দৃষ্টি বলা যাইতে পারে) সহসা আসিয়া তাঁহাদের উপর নিপতিত হয়। কেহবা সৌন্দর্য্যের টোপ গাঁথা বড়সি গিলিয়া ফেলে, কেহবা বিদ্যাবত্তার টোপ গিলিয়া বড়সি-বিদ্ধ হইয়া "পুনর্মূষিক" হয় এবং অবলার বশংবদ হইয়া নূতন ঘরনীর হাতে গৃহস্থালী ছাড়িয়া দিয়া নিজে শুধু গৃহস্বামীর অভিনয়েই মজগুল হইয়া পড়ে।

আমাদের পঞ্চানন্দের বৈঠকের বিপত্নীক পঞ্চকের উপরও অনূঢ়া তরুণীদের মাতৃবাহিনীর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু সভ্যদের নারী-বৈরাগ্যের প্রাবল্যে গ্রহসঙ্কট সাময়িকভাবে খণ্ডিয়া যাইলেও ভবিষ্যৎ সফলতার আশায় মাতৃবাহিনী এই বেযাড়া বিপত্নীক-পঞ্চকের অনাগত প্রবলতম পত্নীপ্লাবনের প্রতীক্ষায় দিন গুণিতে লাগিলেন। রণোৎসবে না হইলেও পরিণয়োৎসবে ইঁহারা প্রত্যেকেই রবার্ট ব্রুসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। ইঁহাদের নীতি-বাক্যই হইতেছে—'একবার না পারিলে দেখো শতবার'।

পাঁচজন সভ্যই আপাততঃ পারিবারিক-দৌরাত্ম্যমুক্তির নিবিড় আনন্দে পরস্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইলেও ইঁহাদের মধ্যে যে খুব বেশী অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। ডালনার আলু, ফুলকপি, ভেট্‌কি, ছানা, কিসমিসের মত ইঁহারাও আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাহা সত্ত্বেও পাঁচজন সভ্যের সহযোগ-সম্মিলনে বৈঠক-গৃহে নিত্য নিশিতে যে একটি স্বাদু রসধারার

সৃষ্টি হইত, তাহা ঘৃত, হিং, লবণ, মশলাদির মিশ্রণে ডালনার রসটুকুর মতই তৃপ্তিকর ছিল। ইঁহারা বহু বিষয়ে ভিন্নরুচির হইলেও প্রেততত্ত্বের গবেষণায় পাঁচজনই একমন ও একমত ছিলেন।

পঞ্চানন্দের বৈঠকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ সভা-সমিতির যেমন সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি, হিসাব পরীক্ষক থাকে, বৈঠকের সে-সব বালাই ছিল না। গোণাগুণ্‌তি হিসাবে পাঁচজন সভ্য; আর পাঁচজনই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। কাজেই সভ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকারের তারতম্যের প্রশ্নে হাতাহাতি কিম্বা খুনো-খুনির কোনই সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

নাম রাখতে টেক্স লাগে না বলিয়াই হয় ত বাঙ্গালীর কুলনাম, রাশনাম, ডাকনাম, উপনামগুলো যোগ দিলে কম হলেও কোন না গণ্ডাখানেক হইবে। তারপর বোঝার উপর শাক-আঁটি—সুগৃহিণীদত্ত আদরের নাম ত ফাউ আছেই। কিন্তু পঞ্চানন্দের বৈঠকের সভ্যদের নামের বাহুল্য ছিল না। বৈঠকের বাহিরে তাদের কি নাম-গোত্র ছিল, সে সন্ধান আমরা করি নাই, তবে বৈঠকের নৈশ আসরে ইঁহারা পরস্পরের প্রদত্ত উপনামেই সুপরিচিত ছিলেন। নেশাখোরদের অভ্যস্ত সময়ে নেশা করিবার স্পৃহার মতন নিশাকালীন বৈঠকের আসরে পরস্পর কর্ত্তৃক নিজ নিজ উপনামে অভিহিত না হইলে সদস্যদের আহ্লাদ-আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হইত না।

সভ্যদের প্রকৃতিগত বৈষম্য যেমন ছিল তেমনি বয়সের তারতম্যটাও ছিল যথেষ্ট। এই দ্বিবিধ বিভিন্নতার জন্য ইহাদের আনন্দানুভূতির

বিষয়ও ছিল বিভিন্নরূপ। সভ্যদের মধ্যে যাঁহার বয়সের সীমা ষাট পার হইয়াছিল, তিনি ছিলেন নস্যের বয়স্য, সভ্যরা তাঁর উপনাম রাখিয়াছিলেন 'নস্যানন্দ'। একাধিক বোম্বাইটিপের "ট্যাডি" নামক বৈদেশিক নস্য নাসিকাবিবরে গাদা বন্দুকে বারুদ ঠাসার মত সশব্দে টাসিয়া বৈঠকে না আসিলে এঁর আনন্দ দানাদার হইবার সুযোগ পাইত না। সভ্যদের মধ্যে বয়সে যেমন প্রবীণ ছিলেন ইনি, তেমনি আলস্যেও ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজ।

যাঁহার বয়স পৌছিয়াছিল পঞ্চান্নের পাশাপাশি। তাম্রকূট-বিলাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন আমির; আর এই আমিরির জন্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন 'গড়গড়ানন্দ' উপনাম। কেহ হয়ত কুতর্ক তুলিতে পারেন, গড়গড়ানন্দ না হইয়া হুকানন্দ হইলে আপত্তির কি কারণ ছিল? যথেষ্টই ছিল—গড়গড়া অভিজাত, হুকা ইতর। দিল্লীর আমির-ওমরাহগণ সকলেই ছিলেন গড়গড়া-সেবী, হুকার আদর ছিল নোকর-চাকরের দরবারে। তাহা ছাড়া আমাদের গড়গড়ানন্দ জীবনে কোন দিনই হুকা-আস্বাদন ত' দূরের কথা, স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি চিরদিন গড়গড়ার অনুরক্ত, আসক্ত—এমন কি সংসক্ত পর্য্যন্ত। আর কিছুর জন্য না হইলেও গড়গড়াটির বিশিষ্টতার জন্যও এই তাম্রকূট-বিলাসপ্রিয় আধুনিক আমিরটির "গডগড়ানন্দ" সার্থক উপনাম। গড়গড়াটি আকারে ছিল মাঝারি রকমের একটি গাগরী; কাজেই তাহার আকারের সহিত সমতা বজায় রাখিতে গিয়া কলকে'টিকে হইতে হইয়াছিল একটি ধূনুচি-বিশেষ। গড়গড়া বড়, কল্‌কে বড়, নলটির কি অপরাধ যে সে ছোট হইতে যাইবে? সঙ্গীদের সঙ্গে সমতা

রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকেও বাধ্য হইয়া হইতে হইয়াছিল নাগরাজের নাতিটি—গজের মাপের পুরা ছু'গিরা কম দশ হাত।

বৈঠক-বাসরে শ্রীগড়গড়ানন্দের প্রথম কাজই ছিল গড়গড়ার জল বদলাইয়া নলের অন্ত্রধৌতি সারিয়া কলকেয় ছটাকভর অম্বরীতামাক টিপিয়া ডজন দুই টিকে চড়াইয়া আগুন ধরাইয়া মিনিট পাঁচেকের জন্য একটু আরাম-বিরাম করিয়া লওয়া। আরাম অন্তে যখন অম্বরী-গন্ধে অন্তর সরস হইয়া উঠে তখন গড়গড়ানন্দের একমাত্র কাজ ছিল আড়াইমুণে দেহভার তাকিয়ায় এলাইয়া দিয়া নাগরাজের নাতির পুচ্ছাগ্রটি মুখে তুলিয়া ফুড়ুক ফুড়ুক গুড়ুক টানা।

বয়সের লহর চলিয়াছিল যাঁর পঞ্চাশের পুলিন ঘেঁষিয়া, তিনি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও তিনপো ইঞ্চি ব্যাসের 'হাভানা' চুরুটের ভক্ত ও ভোক্তা ছিলেন বলিয়া সহ-সভ্যরা তাঁহাকে চুরুটানন্দ উপনামে ডাকিতেন। যিনি পঁয়তাল্লিশে পায়চারি করিতেছিলেন, তিনি মনমোহিনী বিড়ীর অনুরাগী বলিয়া বিড়ী-আনন্দ, আর যিনি চল্লিশে চলিষ্ণু ছিলেন তিনি আধসেরী পেয়ালার দু' পেয়ালা চা বৈঠকে বসিয়া নিঃশেষে পান করিতেন বলিয়া টী-আনন্দ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপনামগুলি সভ্যদের মধ্যেই জানাজানি ছিল, বাহিরে ছিল তন্ত্রোক্ত মূলমন্ত্রেরই মত গুহ্যাতিগুহ্য।

একদিকে যেমন সভ্যদের আনন্দের রকমফের ছিল, তেমনি অপরদিকে প্রেতচর্চ্চা ছিল তাঁহাদের পাঞ্চজনীন আনন্দ। এই আনন্দের বিনোদক ছিল একটি প্লানচেট্ (Planchette) বা প্রেতলিপি যন্ত্র।

নিত্য নিশাগমে এই পঞ্চ আনন্দরা কোন না কোন মৃতের প্রাণশক্তি বা আত্মাকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিয়া আনিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে জ্বালাতন করিয়া তুলিতেন। ইঁহারা সব চেয়ে উৎসাহী ছিলেন মৃত-স্ত্রীদের পারলৌকিক গতিবিধি ও মতিগতির খোঁজ-খবর লইতে। এ আনন্দের প্রেতচর্চ্চা যতই প্রবল প্রচণ্ড হইতেছিল, প্রেতপুরীতে প্রেতদের সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতা ততই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এই প্রশ্ন-উৎপাতের মূলে ছিল আনন্দদের দুরারোগ্য 'সন্দ-বাই'। বিপত্নীকরা যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থবার সপত্নীক হইয়া নূতন করিয়া ঘর-সংসার সাজান, মৃত পত্নীরাও তাঁহাদের সুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণে নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্ব্বহ ভার লাঘব করেন কিনা তাহা জানিবার জন্য ইঁহাদের মন অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। কিন্তু স্বকীয়াদের ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিতে অন্তরে ভয় ও কুণ্ঠা বোধ করিতেন বলিয়া পরকীয়া আত্মাদের প্রশ্নবাণে জর্জ্জর করিতেন। She-আত্মারা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা বলিয়া আনন্দদের প্রশ্নের সরল উত্তর না দিয়া জটিল ও রহস্যময় রূপকের সাহায্য লইতেন। কাজেই বৈঠকের সভ্যরা মন-মরা ও নিরুৎসাহ হইয়া অগত্যা He-আত্মাদের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইঁহারাও প্রেতজগতের গোপনীয়তা বেফাঁস করিতে গররাজী দেখিয়া আনন্দরা ইঁহাদেরও প্রশ্ন করিয়া হায়রাণ করিয়া তুলিলেন।

হইলই বা প্রেত, প্রেতের কি সুখ-সোয়াস্তি থাকিতে নাই! মরজগতের মানুষ বলিয়াই কি যখন তখন ডাকিয়া পাঠাইবে তাহাদের? প্রেতের ধর্ম্ম ডাকিলেই আসিতে হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সময়-

অসময় নাই, কারণ-অকারণ নাই? আনন্দদের এই অত্যধিক দৌরাত্ম্যে প্রেত-লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল, প্রেতের রোষ-বহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কয়েকজন বাঙ্গালী প্রেত এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন এবং অদম্য উৎসাহে ঢেঁড়া পিটাইয়া, শিঙ্গা ফুঁকিয়া, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সর্ব্বশ্রেণীর প্রেতদের এক পূর্ণাঙ্গ সভা আহ্বান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বে বিভিন্ন স্তরের প্রেতগণ বাতাসে ভর করিয়া সভাপ্রাঙ্গণে আসিয়া হাজির হইল এবং যে যে-আসন সুমুখে পাইল তাহাতে জাঁকাইয়া বসিল। সভা আহ্বানকারী ও নামকরা নেতারা আসিলেন সভারম্ভের নির্দ্ধারিত সময়ের অর্দ্ধঘণ্টা পরে এবং আসিয়াই অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একজন সর্ব্বজনবরেণ্য নেতাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সভার কার্য্য সুরু করিলেন।

সভাপতির আহ্বানে প্রথম যিনি বলিতে উঠিলেন, তিনি ছিলেন পূর্ব্বজীবনে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। প্রেতলোকে আসিয়াও বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া এক তেজালো অভিভাষণ ফাঁদিলেন। প্রথমে সুরু করিলেন—মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত প্রেত ও প্রেত্নীগণ! চারিদিক হইতে আপত্তির তুফান উঠিল—প্রেত ও প্রেত্নী শব্দ মর্য্যাদাবাচক নয়, সুরুচিসূচকও নয়। শব্দ দুইটি প্রত্যাহার করিয়া বক্তা পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন—প্রেত-মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা সকলেই জানেন ভূমণ্ডলের একপ্রান্তে পঞ্চানন্দের বৈঠকের পাঁচজন 'আনন্দ'ই পরলোকতত্ত্বের একটি চুম্বক তৈরী করে নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। পঞ্চানন্দদের

প্রেততত্ত্ব-সংগ্রহে যেরূপ প্রবল প্রবণতা দেখছি, তাতে করে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই তমসাচ্ছন্ন জগতের গোপন তত্ত্ব আর বেশীদিন গোপন রাখা চলবে না। মরজগতের এই হিমালয়স্পর্শী অশোভনীয় স্পর্দ্ধাকে পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে, গুঁড়ো গুঁড়ো করতে হবে, বিমর্দ্দন…। সভাপতির বক্তৃতা ঠেকানো ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, বক্তা বিমর্ষচিত্তে গোঁজমুখ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে মহিলা মহল হইতে সায়া, সাড়ি, সেমিজের খসখসানি (যুদ্ধের দরুণ আক্রা বাজারে সাতাশ টাকা ভরি সোনার চুড়ি-বালার ঠুনঠুনি এখন অচল) ভাসিয়া আসিয়া সভাপতি মহাশয়কে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তিনি সভয়ে কাষ্ঠহাসির সহিত মহিলামণ্ডলীর দিকে চাহিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে ইচ্ছা করেন কিনা জানিতে চাহিলেন। সভাপতির আহ্বান পাইয়া একটি আধা-বয়সী সধবা সঙ্কোচহীন সচ্ছন্দ পদে সটান মঞ্চোপরি উঠিয়া আসিলেন। সিংহ যেমন নির্ভয়ে শৃগালের পানে তাকায় তেমনি পৌরুষ-পরাক্রমে পলকের জন্য সভাস্থ সকলকে অপাঙ্গে দেখিয়া উদাত্ত স্বরে আরম্ভ করিলেন:—

'সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় ভগিনী ও ভ্রাতাগণ, আপনারা হয়ত জানেন না, কত বড় বর্ব্বর এই আনন্দের দল। চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া শ্রোতারা চেঁচাইয়া জানাইয়া দিলেন—তাঁহারা জানেন। মহিলা বক্তার মাথার কাপড় এতক্ষণে কাঁধের উপর খসিয়া পড়িয়াছে সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, মুষ্টিবদ্ধ করতল সজোরে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর ছুড়িয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—না, আপনারা কখ্খনও জানেন না। জানলে সভাপতি মহাশয় এই সভায় সর্ব্বাগ্রে বক্তৃতা দেবার প্রাধান্য

পুরুষকে না দিয়ে একজন রমণীকেই দিতেন। তার কারণ, পঞ্চানন্দের বৈঠকের পাঁচ বিট্‌লে মিলে মহিলাদেরই জ্বালাতন করছে সব চেয়ে বেশী। এরা সধবা বিধবা কুমারীদের ডেকে নিয়ে অমর্য্যাদাকর প্রশ্নে হয়রাণ ক'রছে। কেন, কেন এই দৌরাত্ম্যি শুনি? কেন আমরা প্লানচেটের ডাকে দাসীর মতন ছুটবো? কেন, কিসের জন্যে আমরা আমাদের ঘরের খবর, হাঁড়ির খবর বিট্‌লেদের কাছে বেফাঁস করবো?

She-আত্মারা, সঘন করতালি ও হর্ষনাদে বক্তাকে উৎসাহিত করিলেন। আর He-আত্মারা একটি অর্দ্ধ-প্রাচীনার মুখে এই জোর বক্তৃতা শুনিয়া প্রেতলোকের সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া স্বাভাবিক বাক্‌চাতুর্য্য হারাইলেন। শুধু একজন অর্ব্বাচীন-প্রাচীন প্রেত সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? কবে এসেছেন প্রেতলোকে? এই সেদিনও ত আপনাকে বৈতরণীতীরে বিধবার সাজে দেখেছি বলে মনে পড়ছে। এরি মধ্যে কবে সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে শাঁখা শাড়ি পরে সধবা সাজলেন? সধবাটি লজ্জাভাসের সহিত মাথায় একটু কাপড় ও মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন—আপনি ঠিকই দেখেছিলেন, বিধবার সাজেই আমি বৈতরণী পার হই, আর ঐ বৈতরণীতীরেই আবার সধবার জীবন বরণ করি। আর আমি কে জিজ্ঞেস করছেন? আমাকে না চেনবার কোন কারণই নেই। ভুষণ্ডীর মাঠের নেওকালীকে না জানে কে? আমি তারই ছোট বোন। প্রবীণ প্রেতরা এক বাক্যে চেঁচিয়ে বললেন—কি সর্ব্বনাশ! প্রেতলোকেও বিধবা বিবাহ। তাও কিশোরী বা যুবতীর নয় প্রাচীনার। প্রেতলোক এত দিন পরে সত্য সত্যই জাহান্নমে যেতে বসেছে।

অর্ব্বাচীন-প্রাচীনটির কথার তাতে সধবা প্রৌঢ়াটি আগুন হইয়া উঠিলেন। পুরুষ হইয়া মেয়েদের সমালোচনা। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। কে রে টিটলে বুড়ো, একবার মুখখানা দেখি! ওমা, মামাশ্বশুর-ঠাকুর যে। বলিয়াই জিবে কামড় ও মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন। She-আত্মাদের মধ্যে কুমারী, নব-বিবাহিতা কিশোরী ও যুবতীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অর্দ্ধবয়সী ও বুড়ীরাও হাসিল, তবে হি হি করিয়া নয়—মুচ্‌কাইয়া। বক্তা মামাশ্বশুরকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জভাবে মঞ্চ হইতে নামিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু She-আত্মারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি, নেমে যাচ্ছেন যে বড়। না না, যাবেন না। আমরা আপনার কাছে অনেক কিছু শুনতে পাবো আশা করছি, এ প্রেতরাজ্য, এখানে পূর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত। এখানে পুরুষকে আমরা লজ্জা করি না। তা'ছাড়া আমাদের মর্ত্ত্য-লীলায়ও আজকাল কোন পুরুষকে—হোক্‌গে মামাশ্বশুর, হোক্‌গে ভাশুর, লজ্জা-সরম করি না। আপনি ঘোমটা খুলে, লজ্জাভয় তুচ্ছ করে আবার আরম্ভ করুন।

সধবাটি সাহসে ভর করিয়া মঞ্চোপরি উঠিয়া মাথার কাঁপড় সরাইয়া আবার বলিতে সুরু করিলেন—দেখুন, আমার বয়স পঞ্চাশ হ'লেও বিবাহের পক্ষে মোটেই বেশী নয়। তাছাড়া, আমি বিধবা হয়ে মাত্র একবার বিয়ে করেছি। পুরুষরা যতবার বিপত্নীক হয় প্রায় ততবার বিয়ে করে। এই আমার মামাশ্বশুরটিকে সাক্ষাতে দেখ্‌ছেন আপনারা, ইনি একজন নামজাদা তেজবরে। তৃতীয় পক্ষের বৌটিকেও প্রেতলোকে পাঠিয়ে যখন 'চতুর্থ পক্ষের' চেষ্টায় ঘোরাঘুরি

করছিলেন, বে-রসিক যম একদিন নিজ দরবারে ডেকে আনলেন এই আশী বছরের বিবাহবিশারদকে। একজন আশীবছরের তেজবরের যদি নতুন করে টোপর পরবার সাধ জাগতে পারে তা' হ'লে আমি পঞ্চাশ বছর বয়সে নতুন করে সধবা সেজে এমন কি দোষ করেছি?

She-প্রেতরা একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে জানাইলেন—কোন দোষ করেন নি। অবলা হয়ে আপনি প্রবল সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

সধবাটি ইহাতেও খুশি না হইয়া বলিলেন—আপনাদের বিচারেও আমি নির্দ্দোষ; কিন্তু পুরুষ-প্রেতরা নীরব কেন? সভাপতি মহাশয় কি আমার এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

সভাপতি মহাশয়ের প্রচুর সৎসাহস ছিল; তাহা ছাড়া সধবাটি সভার সময়ের যথেষ্ট অপব্যয় করিয়াছেন দেখিয়া কৌশলে তাঁহাকে আসনস্থ করিবার উদ্দেশ্যে উল্লাসপূর্ণ তৎপরতার সহিত বলিলেন—আমি এই সভার প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি কোন দোষই করেননি। সত্য সত্যই সৎসাহসের কাজ করেছেন। আপনি প্রেতলোকে এসেও যে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এই জন্যে সভার পক্ষ হ'তে আপনাকে একটি স্বর্ণপদক দেয়া হো'ক এই প্রস্তাব করেছি। সমস্ত She-আত্মারা এবং কিশোর ও যুবক He-আত্মারা সমস্বরে সভাপতিকে সাধুবাদ দিলেন। সধবাটি পুনর্ব্বার বলিবার জন্য জিহ্বা শানাইতেছিলেন দেখিয়া সভাপতি হাত জোড় করিয়া মোলায়েম কণ্ঠে বলিলেন—সভার সময় সংক্ষেপ; অন্যদেরকেও বলবার ফুরসুৎ দেওয়া চাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখন আসন গ্রহণ করেন, তাঁরা কিছু বলিতে পারেন।

সধবাটি স্মিত-মুখে মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন।

সভাপতির ইঙ্গিতে এবং He-প্রেতদের সঘন করতালির মধ্যে এবার যিনি সদম্ভে বক্তৃতা দিতে উঠিলেন, তিনি ছিলেন মরজগতের মহকুমার মোক্তার। মোক্তার মহাশয় সুরুতেই 'হুজুর' সম্বোধন করায় সভাতে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। সভাপতি অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন—মোক্তার মহাশয় হয়ত ভুলে গেছেন এটা ফৌজদারী কাছারী নয়, আর–আমিও বিচারপতি নই। মোক্তার ইহাতে লজ্জা পাইলেন না, কারণ লজ্জা-সরম থাকিলে মোক্তারী অচল। নূতন উৎসাহে আরম্ভ করিলেন—হুজুর—না-না হুজুর নয়, সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আজ আমাদের এই প্রেত-লোক বিষম বিপন্ন। পঞ্চানন্দের বৈঠকের বিপত্নীক-পঞ্চকের স্পর্দ্ধা পঞ্চমে উঠেছে। আমার প্রথম প্রস্তাব, ইহাদের অবিলম্বে 'শ্রীঘরে' অর্থাৎ প্রেতলোকে আনবার ব্যবস্থা করা হোক।

কিশোর-কিশোরী আর যুবক-যুবতী আত্মারা এক সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলিল—'শ্রীঘরে আসুন, শ্রীঘরে আসুন।'

নাকের ডগায় চশমাধারী একজন জজের আত্মা বলিলেন—চিত্রগুপ্তের দপ্তরে এমন কোন নজীর নাই।

মোক্তারী আত্মা টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন নাই-বা থাকলো—টাকায় কি না হয়! একটা নজীর নূতন করে ঢুকিয়ে দিতে এমন কি লেঠা? একবার যদি কোন রকমে 'আনন্দ'দের এখানে আনা যায়, বেশ এক হাত দেখে নেওয়া চলবে।

কাঁচা বয়সের She-আত্মা ও He-আত্মারা সমস্বরে বলিয়া উঠেন—আনন্দদের আসুন, শীগ্‌গীর আসুন।

—আলবৎ আনবো, বলে মোক্তারী আত্মা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

জজের আত্মা বলিলেন—কি মুস্কিল! জ্যান্ত মানুষকে প্রেত-লোকে আনবেন কেমন করে?

—ছলে বলে কলে কৌশলে যেমন করে পারি। মোক্তার হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, জ্যান্তরা কি মানুষ। ওরা পশুর অধম, নিমকহারাম, বেইমানের শিরোমণি। আমি মর্ত্তে থাকা কালে বহু মক্কেলের টেঁকের টাকা নিজের সিন্দুকজাত করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়…

সভাপতি মহাশয় ঘন্টি বাজাইয়া বলিলেন—আপনি বসুন নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হয়েছে।

মোক্তারী আত্মা কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন—হুজুর, আমার যে অনেক ভালো ভালো নজীরের কথা বলবার আছে। একটি ফক্কড় কিশোর আত্মা বলিয়া উঠিল—এখন ধামাচাপা রাখুন; আগামী জন্মে মহকুমার হাকিমের কাছে বলবেন। সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একটি হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল। অগত্যা মোক্তারী আত্মা মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

সভাপতির আহ্বানে এবার যিনি উঠিলেন, গড়গড়ানন্দের গড়গড়াটির মতনই ছিল তাঁর গঠন-গরিষ্ঠ। প্রেত-লোকে ইনিই ছিলেন বৃহত্তম দেহ, গুরুতম ভুঁড়ি আর উচ্চতম কণ্ঠের গৌরবিত অধিকারী।

বাক্যালাপ ও বক্তৃতার সময় ইঁহার তালতরুসম বপুখানা যখন ডাইনে-বাঁয়ে হেলিত দুলিত তখন ভুঁড়িটিও সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-সাগরের নিঃসঙ্গ একটি ঢেউয়েরই মত তরঙ্গায়িত হইত। ইনি শিষ্টাচার-নীতিকে যৌবনেই ইতি দিয়াছিলেন; সেজন্য শিষ্টাচারের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ভীমনাদে হুঙ্কার দিলেন—শুনুন, আপনারা সবাই। যে গুরুতর সমস্যা আমাদের সুমুখে উপস্থিত তার সুমীমাংসা উকিল-মোক্তার কিম্বা অবলা-প্রবলা দ্বারা সম্ভব নয়। এরূপ জটিল দুরূহ দুঃসাহসিক কাজ একমাত্র আমার দ্বারাই সফল হতে পারে। দুষ্টের দমনে পার্থিব-লোকে আমার বেশ একটু সুনামও ছিল। আপনারা হয় ত আমাকে চেনেন না, সে-জন্যে একটু আত্মপরিচয় দিচ্ছি।

শুনুন, মর-লোকে আমি ছিলাম এক সাক্ষীগোপাল জমিদারের খ্যাতনামা ম্যানেজার; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল আমার। শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করত, ইচ্ছা করলে বাঘ-মোষকে একঘাটে জল খাওয়াতে পারি আমি। ম্যানেজারী আমলে শ'য়ে শ'য়ে উকিল মোক্তারকে ঘোল খাইয়েছি। তাদের এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারতাম। এখানে অনেক উকিল-মোক্তারের আত্মাই উপস্থিত আছেন; অনেকেই হয়ত আমাকে চেনেন।

নরম গলায় ডজনখানেক আইনজ্ঞ বলিলেন—কই, আপনাকে ত' আমরা চিনি না।

ম্যানেজারী আত্মা বলিয়া চলিলেন—আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান দেখছি। কেউই চুল সরিয়ে কাটা কাণ দেখাতে রাজী ন'ন। বেশ,

বশ; আমিও বুদ্ধিমানের ভক্ত। আপনাদের কথা শুনে আমি খুবই খুশী হ'লাম। এখন আমার কথা শুনুন। দুষ্টের দমনে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা' পূর্ব্বেই সভায় নিবেদন করেছি। বৈঠকের আনন্দরাও অতি দুষ্ট। সভা যদি এদের দমনের ভার আমার ওপর ছেড়ে দেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আমি নিশ্চয়ই সফলকাম হ'ব। আমার সুদীর্ঘ ঐহিক জীবনে কোন দিনই আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই নি।

একজন কণ্ঠিধারী প্রেত ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়েছ বহু বারই, তবে স্বার্থভ্রষ্ট হওনি একবারও।

চারিদিক হইতে 'চুপ করুন,' 'চুপ করুন' বেরিয়ে যান; বলিয়া শ্রোতারা হৈ চৈ করিয়া উঠিল।

ম্যানেজার সদম্ভে বলিলেন—প্রেতলোকে আমি কারো ম্যানেজার নই যে, যে-সে আমাকে 'তুমি' বলবে। এ-বিষয়ে আমি সভাপতির মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

বাদ-বিতণ্ডায় বিরক্ত হইয়া সভাপতি বলিলেন—আপনারা হিন্দুস্থানে যেমন সভাসমিতি পণ্ড করেন, প্রেত-স্থানেও কি তাই করবেন?

শ্রোতাদের তরফ থেকে একজন বলিলেন—সভাপতির স্মরণ রাখা উচিত যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে।

পাকিস্থানপন্থী একজন হাঁকিয়া বলিলেন—হিন্দুস্থানের পাশাপাশি পাকিস্থান হ'লেই গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মোক্তার অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—থামুন, থামুন, প্রেতস্থানে বসে

পাকিস্থানের ওকালতি করবেন না। পাকিস্থান করবে গোলমাল ঠাণ্ডা! আমি একাই ঠাণ্ডা করে দিতে পারি পাকিস্থান হিন্দুস্থান দুই-ই —যদি ঐ বে-খাপা আর্ণস্ একটা চোখ না রাঙাতো।

নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেও শ্রোতাদের আগ্রহে সভাপতি বক্তাকে আরো দশ মিনিট সময় দিলেন। ম্যানেজার পুনরায় সবিক্রমে স্বরু করিলেন—চুলোয় যাক পাকিস্থান হিন্দুস্থান, সভার অনুমতি পেলে পাপাত্মা পঞ্চানন্দদের আমি একাই ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

শ্রোতারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া করতালি দিয়া বলিলেন—ঠাণ্ডা করে দিন, ঠাণ্ডা করে দিন।

শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানাইয়া ম্যানেজার বলিলেন—আজ মহালয়া অমাবস্যা; তার ওপর শনিবারও। প্রেতের পক্ষে নর-শত্রু দমনের এমন সিদ্ধিযোগ সহজে মিলে না। আজ আপনাদের প্রতিনিধি হ'য়ে পঞ্চানন্দের বৈঠকে হাজির হ'বার অনুমতি দিন আমাকে। দেখুন, বাছাধনদের কী রকম সায়েস্তা করে আসি।

বহু বাদ-বিতণ্ডার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ম্যানেজারের আবেদন মঞ্জুর হইল। হৃষ্ট-চিত্ত প্রেতদের বজ্র-বিদারী হর্ষনাদ ও করতালি শব্দ প্রেত-লোকে যে ভৈরব শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, তাহার প্রতিধ্বনি সন্ধ্যানিলে ভাসিয়া আসিয়া আনন্দদের অন্তর স্পর্শ করিল; তাঁহারা প্রেতলিপি-যন্ত্র লইয়া প্রেতাহ্বানে বসিয়া গেলেন।

প্লান্‌চেট হাতে করিয়া গড়গড়ানন্দ বলিলেন—এসো হে আনন্দ ভায়ারা, সদ্য লোকান্তরিত দিবাকর শর্ম্মাকে ডাকা যাক আজ।

শর্ম্মা মস্তবড় কবি। নস্যানন্দ কোঁচায় নাসাগ্র মুছিয়া বলিলেন—কবি টবিকে ডেকে কি কাজ? দার্শনিক দত্তজাকে ডাকো। চুরুটানন্দ একটু আগাইয়া বসিয়া বলিলেন—দর্শনের কি জান যে দার্শনিককে ডাকবে? তার চেয়ে হালে যারা যুদ্ধে মরেচে তাদের একজনকে ডাকো। সেন্সরদের কাটাকুটির জ্বালায় একটাও যদি খাঁটি খবর পাওয়া যায়!

গড়গড়ানন্দ হতাশের স্বরে বলিলেন—তা ডাকতে হয় ডাকো, কিন্তু খাঁটি খবর পাবে না। লড়াইতে কি শুধু লড়ুয়েই মরেছে, সেনসর কি একটাও মরেনি মনে করচো।

বিড়ি-আনন্দ ভারিক্কি চালে বলিলেন—আজ আর বাইরের লোক ডেকে কাজ নেই। মহালয়া দিনটা, আমাদের পল্লীর কুলাবধূত বাঁড়ুজ্যে মশায়কেই না হয় ডাকো।

ধার্ম্মিক সাজতে অনেকেরই অসম্ভব রকম সখ দেখা যায়। বিড়ি-আনন্দ ধার্ম্মিক সাজিয়া সকলের ওপর টেক্কা দেয়, টী-আনন্দের তাহা বরদাস্ত হইল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন—ঐ যা, ভায়া যে আমারই মুখের কথাটা কেড়ে নিলে হে। আমি বাঁড়ুজ্যে মশায়ের কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলুম।

কুলাবধূতকে ডাকাই স্থির হইল। লিপি-যন্ত্রের উপর হাত রাখিয়া সকলেই আত্মার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অচঞ্চল থাকিয়া যন্ত্র সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পঞ্চানন্দ পরস্পরকে চাপা-কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন—এসে গেছেন।

গড়গড়ানন্দ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি কুলাবধূত বাঁড়ুজ্যে মশায় ?

লিপিযন্ত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া লিখল—আমি চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, কুলাবধৃত সব ; আজ আমি সমস্ত প্রেতের প্রতিনিধি ।

চুরুটানন্দ বলিলেন—না না, আপনি বাঁড়ুজ্যে মশায় নন ; তিনি ছিলেন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। আপনি মূর্খ, অবধূত লিখতে ধ-য়ে হ্রস্ব-উকার দিয়েছেন ।

প্রেত লিখিল—প্রেত-লোকে সবই হ্রস্ব ; সেখানে দীর্ঘ বলে কিছু নেই ।

টী-আনন্দ বলিলেন—সত্যি করে লিখুন, কে আপনি ?

প্রেত লিখিল—সিংহপুরের ম্যানেজার ।

সকল আনন্দরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কি সর্ব্বনাশ। বটব্যাল ম'শায় ? আমাদের জমিদারবাবুর ম্যানেজার ?

—আজ্ঞে হুজুর ; এবার ত' চিনলেন ? এখন বাকী বকেয়া খাজনা ফেলুন ঝন ঝন ক'রে ।

—আপনি ত' জালিয়াতির জন্যে জেলে গেছলেন ? টী-আনন্দ প্রশ্ন করিলেন ।

গড়গড়ানন্দ গড় গড় করিয়া বলিলেন—জেলে একটা প্রজাকয়েদী ঠেঙাতে গিয়ে লোকটার যে ফাঁসী হয়েছিল হে ।

লিপি-যন্ত্র লিখিল—ফাঁসী নয়, কাশী ; জেল নয়, শ্বশুরালয় ।

পঞ্চানন্দরা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—না না, আমরা আপনাকে চাই না; আপনি চ'লে যান।

লিপি-যন্ত্র লিখিল—চাই না বললেই চলে। বাড়ীতে ডেকে এনে খালি হাতে বিদেয় করতে চাও? তোমরা সিংহপুরের প্রজা, স্বয়ং ম্যানেজার সুমুখে হাজির, কোথায় নজরসহ বাকীবকেয়া ও হালের খাজনা শোধ করবে, না শুধু হাতে বিদায় করতে চাচ্ছ! বাকীজায়টা না হয় পড়েই শোনাচ্ছি।

সমস্ত আনন্দরা শিব-নেত্র করিয়া বলিলেন—কী ভয়ানক লোক! প্রেত-লোকে গিয়েও বাকীজায় লিখছেন।

প্রেত-লিপিযন্ত্র লিখিল—বাকীজায় লিখবো না ত কী—তোমাদের জন্যে তামাক আর চায়ের চাষ ক'রবো? শোন বাকীজায়টা—গড়গড়ানন্দ পাঁচ হাজার, নস্যানন্দ পাঁচ শ, টীআনন্দ পাঁচ, চুরুটানন্দ পাঁচসিকে আর বিড়ি-আনন্দ পাঁচ আনা মাত্র। ফেলো পাওনা-গণ্ডা, টাকাপয়সার ঝনৎকারে প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।

নস্যানন্দ নাকি সুরে বলিলেন—দোহাই ম্যানেজারবাবু, ট্যাঁকে একটিও টাকা নেই, থাকলে আজই একশিশি 'ট্যাডি' কিনতুম। নস্য বাড়ন্ত; তা' হোক, নিন এক টিপ, এক টিপ নিয়েই কিন্তু রেহাই দিতে হ'বে।

অন্যান্য আনন্দরাও জানিয়ে দিলেন তাঁদের ট্যাঁকও সিকেয় তোল গোছের; কাণে ধ'রে টানলেও একটি কানাকড়ি মিলবে না।

প্রেত লিখিল—মাতালে ঠকাবে শুঁড়িকে। প্রজা দেবে চোখে

ধুলো ম্যানেজারের। ট্যাঁকে টাকা না থাকলেও কাছায় বাঁধা আছে নিশ্চয়ই। ফেলো ঝন ঝন ক'রে—নইলে কিন্তু এখুনি পেয়াদার হাওলা কর'বো।

আনন্দরা নিরানন্দ হইয়া বলিলেন—আমরা না হয় যন্ত্রটা তুলেই রাখছি, আপনি চ'লে যান।

যন্ত্র লিখিল—পার ত' রাখো তুলে।

আনন্দদের হাত যেন যন্ত্রের সঙ্গে পেরেক দিয়া আঁটা। সভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

যন্ত্র লিখিল—এটা একটা তান্ত্রিক পীঠস্থান, এখানে পাতা রয়েছে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। ইহা ভয়েরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ।

ঘরের মধ্যে কারা যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আনন্দরা চেঁচাইয়া উঠিলেন—কী সব ভূতুড়ে কাণ্ড সুরু হ'য়েছে।

প্রেত লিখিল—ভূত নামাতে বসেছ, ভূতুড়ে কাণ্ড হবে না ত' কি পরীর নাচ-গান হবে? ও আমার পেয়াদা-পাইকের হাসি।

আনন্দরা বলিলেন—মিছে কথা; ও ত' মেয়েলি হাসি।

প্রেত লিখিল—মেয়েলি হাসিই ত'; ওরা পৃথিবীর প্রগতিপন্থিনী। প্রেত-লোকের পেয়াদা-পাইকের পদগুলি এখন ওদেরই একচেটিয়া। অফিস-আদালতের কাজও কিছু কিছু ওদের আয়ত্বে এসে গেছে।

আনন্দরা স্বীকার করিলেন, তাঁহাদের খুব শিক্ষা হইয়াছে। তাঁহারা আর প্রেত-তত্ত্ব ঘাঁটিবেন না। তাঁহারা ম্যানেজারকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

ম্যানেজার-প্রেত হা হা করিয়া উচ্চ-হাস্যে বলিলেন—ধুলো পায় বিদায় করতে চাচ্ছ যে, কোথায় মিঠাই-মণ্ডা খাওয়াবে, না বলছো—আপনি চলে যান। বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি; কিন্তু তার আগে তোমাদের কিছু খাইয়ে যেতে চাই। নাও এবার নিজে নিজে কাণমলা খাও ত' আমার আনন্দ ভাইরা।

আনন্দরা—আজ্ঞে হাত যে তুলতে পারছি না।

প্রেত—বেশ, তা' হলে নাক-খৎ খাও।

পঞ্চানন্দ নাক-খৎ খাইতেই, কে যেন লিপি-যন্ত্রটা ছুড়িয়া দিল দেয়ালের গায়। টেবিলটা পড়িল পা উল্টাইয়া—মেঝের উপর মুখ থুব্‌ড়াইয়া; সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল, দরজা ঠেলিয়া যেন লক্ষ শকুনি পাখসাট মারিয়া উড়িয়া গেল।

টী-আনন্দ—নাঃ, এটা পঞ্চমুণ্ডীর আসন না হয়ে যায় না!

গড়গড়ানন্দ—এসো পঞ্চানন্দের বৈঠকের আজ অন্তর্জলি করা যাক।

নস্যানন্দ—তাই করো, রাত-বে-রাত আর বাইরে থাকা নয়।

বিড়ি-আনন্দ—এসো, আবার নতুন করে ঘর-সংসার পাতা যাক।

চুরুটানন্দ—নতুন গিন্নীর আঁচলের গেরো হ'য়ে থাকা যাবে—কি বলো?

সকল আনন্দ মতৈক্য হইয়া আনন্দে বলিলেন—তথাস্তু।

# গাঙ্গা কি সিংগি হয়?

এক

সে বছর বর্ষায় প্রকৃতিকে যেন দানবে পেয়েছিল। মেঘের সে কি আড়ম্বর, আর কি গর্জ্জন। বর্ষণও হলো এতই প্রচুর যে, দামোদরের উদরেও তার স্থান হলো না—উৎকট উদ্‌গারে সে ছড়িয়ে দিলে বিপুল জলরাশি শতদিকে। চূর্ণ করে দিলে রেলপথ, সেতু-বাঁধ, ভাসিয়ে দিলে বাড়ীঘর, জীবজন্তু, ধ্বংস করে দিলে চাষীর ক্ষেতী ফসল; অপেয় করে দিলে নদী, খাল আর পুকুরের জল।

বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা দামোদরের একটা চিরকেলে বদ অভ্যাস, কিন্তু সাগরের ত সে স্বভাব নয়; নিজের সীমা লঙ্ঘন করে না বলে বরং একটা সুনামই আছে তার, আজ সেও আত্মমর্য্যাদা ভুলে তরঙ্গের সহস্র ফণা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাংলার বুকে। দুর্ভাগ্য নিঃসঙ্গ আসে না বলে একটা জনশ্রুতি আছে। বাংলার দুর্ভাগ্যের দিনে এর ষোলআনা রকম প্রমাণ পাওয়া গেলো। বর্ষণের সঙ্গে প্লাবন, প্লাবনের সঙ্গে আকাশ আর বোঝার উপর শাক-আটির মত আকাশের সঙ্গে এসে নাকাল করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেরা অবদান—রেশানিং। যমে মানুষে চলছে অসম প্রতিযোগিতা। মুমূর্ষু মানুষই

বরণ করে নিলে পরাজয়ের লজ্জা—বিজয়ের জয়মাল্য লাভ করলে নির্লজ্জ যম।

ষোল-আনা রকম যমকে দূষলেও সেটা দোষেরই হবে। যমের অরুচি বলে যে-সব দুস্থরা রেহাই পাচ্ছিল, যমানুচর পুঁজিপতিরা তাদেরও করলে গো-গ্রাসে উদরস্থ। রেশানিংএর সঙ্গে-সঙ্গে ধান-চাল, আটা-ময়দা, চিনি-মিশ্রী এমন কি পাথুরে-কয়লা পর্য্যন্ত রাতা-রাতি উধাও হলো বাজার থেকে, অথচ এ-সব জিনিষই চারগুণ দামে অযচ্ছল মিল্‌ত—বিশেষ বাজারে।

## দুই

বাংলার এই দুর্দ্দিনে একটি লজ্জা-করুণ ঘটনাই আজ বলছি এখানে। ছুটির দিন, আহারের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে দিবা-নিদ্রাটাও হয়েছিল একটু মাত্রাতিরিক্তই। ঘুম যখন ভাংলো, তখন চারটে বেজে গেছে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলাম রবিবাসরীয় অভ্যাস মত আজ আর মৃদুলা তার ক্লান্ত দেহটি বিছিয়ে দেয়নি বিছানায়। একটা আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়ে ঝিমুচ্ছিল, আর তার নাসিকা ভদ্রভাবে 'ব্রড-কাষ্ট' করে জানিয়ে দিচ্ছিল—সে তখন তন্দ্রার রাজ্যে বিলাসে বিভোর।

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই মৃদুলা। সারা দিন মৌমাছির মত গৃহকর্ম্মেও যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনি গৃহমাছির মত ভনভন করতেও সিদ্ধমুখ। গৃহস্থালীর ঝামেলার মধ্যে সংসারের পাট সেরে নিজের ব্লাউজ, শেমিজ, আমার শার্ট-পাঞ্জাবী, ঝি-চাকরের শেমিজ-কামিজ তৈরী

করে নিয়েও 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র আ-বিবাহ অভ্যাসটি কায়দায় রাখবার সুযোগ-সুবিধা, সে যে কি করে পায় তা আমি ত আমি, দেবতারাও জানেন না।

উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে দুপুর বেলা যে একটু নিঃশ্বাস ফেলবে সে সময়টুকু পর্য্যন্ত বেচারীর কোষ্ঠিতে লেখেনি। শুধু এই রবিবারের দিনটাই দু'দশ মিনিটের জন্যে একটু আড়ামোড়া ভাঙ্গবার ফুরসুৎ পায় সে। আজ তারও ব্যতিক্রম দেখে আশঙ্কা হলো—'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ'। তাই তার তন্দ্রা না ভাঙ্গিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হাতলহীন কেদারাটায় বসে পড়লাম। চোখ দুটো ছুটে গেলো সুমুখের বাড়ীর আলিসায়-রাখা ফুলের টবগুলোর ওপর—যেখানে দু'-পাঁচটা রূপাকৃষ্ট মৌমাছি বৃথাই উড়ে বেড়াচ্ছিল মধুর সন্ধানে। মক্ষিকা-গুঞ্জন শুন্‌তে শুন্‌তে হঠাৎ টের পেলাম নাসিকা-গুঞ্জন থেমে গেছে। সভয়ে চেয়ে দেখি, অতি বাস্তব ভাবেই মৃদুলা সজাগ। সম্ভবতঃ সিগারেটের ধোঁয়াই এই অকালবোধনের জন্যে দায়ী। চার চোখের মিলন হ'তেই বেশ করে চোখ দু'টোকে দুহাতে রগড়ে নিয়ে মৃদুলা তার স্বভাব-অসিদ্ধ নীচু পর্দ্দায় জিজ্ঞাসা করলে—ঘুম ভাঙ্গলো? কখন থেকে ঠায় বসে আছি।

মেজাজটা বে-খোস নয় দেখে একটু হেসেই বললাম—ছুটির দিন আহারের মত ঘুমটাও যদি একটু বেশীই হয়ে থাকে তাতে এমন কি দোষের হয়েছে?

দোষের কথা হচ্ছে না, দরকারী কথা সময়মত বলতে না পারলে মন খিঁচড়ে যায় কি না তুমিই বলো না?

মৃদুলার কথার সুরে অভিমানের সন্ধান পেয়ে একটু সাবধান হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—ঘুমোও নি যে আজ ?

—ফুরসুৎ পেলাম কৈ ?

—কেন, রবিবারে আবার ফুরসুতের অভাব কি ?

—যা হোক মানুষ বটে !

—কি রকম ?

—কি রকম আবার কি ? ঘর সংসারের কোন খবরটা রাখো ? ভিক্ষে দেবার মত মাস-খরচার টাকাটা ফেলে দিয়েই ত খালাস তুমি, ঘানি টেনে মরবার বেলায় এই মৃদুলাই।

মৃদুলার মান-অভিমান, রাগ-বিরাগের চড়াই-উৎরাই সবই আমার নখদর্পণে। আজকার অভিমানের রেশটা অন্য দিনের চেয়ে মৃদুতর দেখে মৃদু হাসির সহিতই বললাম—ভাগ্যিস তুমি ছিলে, তাই ! নইলে এই বে-হুঁসিয়ার নাবালকের নৌকো কবে বানচাল হয়ে পড়তো !

স্কন্ধচ্যুত চাবির গোছাটাকে ঝনৎকারে স্বস্থানে স্থাপন করে, বিদ্রূপের মধ্যেও একটু প্রীতির রসান দিয়ে মৃদুলা হাসির সহিতই বললে—কী আমার কীর্ত্তিমান্ পুরুষ গো ! এই মেয়েলীপনার জ্বালায় হেদোয় ডুবে মরতে ইচ্ছে যায়।

—আহা, ওটা আর করো না। শেষে কি আমাকে টানতে হবে ঘানি ?

—থামো ; অমন মিনমিন করবে তো সত্যি ডুবে মরবো।

তোমার জন্যে কি কম কথাটা শুনতে হয়? পাড়ার ধিঙ্গী মাগীরা ত হিংসেয় চৌচির! আমি নাকি সোয়ামিকে গাধা বানিয়েছি। আমিও বড় গলায় বলি—বানিয়েছি ত বেশ করেছি, তোদের কি না? পারিস ত বের কর না সাত গাঁ খুঁজে অমন আর একটি!

মৃদুলার স্বামী-গৌরবের বহর দেখে হেসে বললাম—দোকানিদেরও রবিবার বেশ্ পতিবার ছুটি আছে—মেয়েদের হিংসের দণ্ডপলও ছুটি নেই!

—আহাহা! আর তোমাদের আছে। পাডার মুখপোড়াদের মুখেও কি কম বিষ? বলে কিনা—আমি নাকি ক'নে-বৌ থেকেই ডবল প্রমোসান পেয়ে রাতারাতি গিন্নী হয়ে বসেছি। আক্কেল দ্যাখো মিন্ষেদের, পরের ঘরের কথা নিয়ে কি রকম রসের সম্বরা দেয়!

অন্তরে সঙ্কটতারণ শ্রীমধুসূদনের নাম জপ করে' মুখে ছোট্ট একটি হাসির ফিকা ঝিলিক ছড়িয়ে বললাম—যা রটে তা কি একেবারে ষোল আনা মিথ্যে হয়? যে দিন পরিণয়-প্রণালী পেরিয়ে সংসার-সাগরে তরী ভাসালাম, সে দিন তুমিই ত মুস্কিল-আসান হয়ে হালে বসেছিলে। সে দিন থেকে তুমি সাংখ্যের প্রকৃতি, আমি পুরুষ; তুমি কর্ম্মব্যস্ত, আর আমি বুনি আলস্যের জাল!

—আহাহা, কি আমার পাকা তাঁতি রে! তবু যদি—কথাটা আর শেষ করলো না, ফিক করে এক ঝলক হেসে মুঠো মুঠো চূর্ণ-চুণী ছড়িয়ে দিলে ঘরময়।

মৃদুলা ছিল ঠিক সেই ধরণের মেয়ে, যারা নিজের ঘর-গৃহস্থালীর অধিকার-সীমার মধ্যে অন্যের তিলমাত্র আধিপত্যও বরদাস্ত করতে পারে না। একটা ফার্সী বয়ান বলছে, 'এক কম্বলে দশজন দরবেশ থাকতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুই রাজার জায়গা হয় না।' কথাটা এখানে খানিকটা খাপছাড়া হলেও মৃদুলার মনোভাবটা বুঝবার পক্ষে সার্থকতা আছে। তার গৃহস্থালীর রাজপাটে সে-ই সম্রাজ্ঞী, পৌরজনগণ প্রজাগণের মতই উপেক্ষণীয়। স্বামী বা শাশুড়ী যে-ই হো'ক টুকিটাকি কিছু বলতে গেলেও 'চঞ্চুপ্রবেশঃ মূষলপ্রবেশঃ' আশঙ্কা ক'রে মৃদুলার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটত। নিজের মা-বাপ, ভাই-বোন ছেড়ে সে যে পরের বাড়ী এসেছে, সে কি বাঁদীগিরীর জন্যে? না,— সে এসেছে ঘরের ঘরণী হ'তে—ষোল আনা, পুরোদস্তুর। মৃদুলার শাশুড়ী তার মানে আমার গর্ভধারিণী, কাশীবাসিনী; আর আমি ত মৃদুলার বিনি পয়সার বান্দা, তাঁবেদার। ফলে মৃদুলাই গৃহের স্বৈরতন্ত্রের একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী! ন'মাসে ছ'মাসে যদি কখনো বরাদ্দের টাকায় খরচ না কুলায়, তখনই শুধু সে এসে প্রজার মত প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতো আমার কাছে এবং বিবিধ কৈফিয়তে, হাসিতে চটুলতায় সংলাপ সু-রসাল করে প্রয়োজনীয় টাকা আদায় করে বিজয়িনীর গর্ব্বিত গতি-বিলাসে স্বস্থানে, কি না ভাঁড়ার বা হেঁসেলে চলে যেতো। তাই মৃদুলার এই হাসি ও কলভাষ টাকা আদায়েরই পূর্ব্বাভাস সন্দেহ করে স্মিত মুখেই প্রশ্ন করলাম—এখন বলতো, এ মাসে আর কত টাকা চাই তোমার?

মৃদুলা সবিস্ময়ে খোঁজ করিল—টাকা চাই কে বললে?

—না, কেউ বলে নি, ভাবলাম, যা মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন—মৃত্নলার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই জিহ্বা স্তব্ধ হয়ে গেল। দেখলাম পৃথিবীর ছায়াপাতে চাঁদের মতই তার মুখখানি কলঙ্কিত—রুষিতও। আশ্চর্য্য মেয়ে এই মৃত্নলা! পলকের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলে এবং শ্যামাঙ্গীর স্নো-পাউডার মাখার মত মুখে একটু ম্লান হাসি আমদানী করে বল্‌লে—ঐ ত তোমার দোষ; কাছে ঘেঁষলেই মনে কর টাকার মতলবে এসেছে। না গো না, সে ভয় নেই; আমি এসেছি পোড়ারমুখোদের জ্বালায়।

—তারা, কারা?

—ঐ তোমার কণ্ট্রোল-দোকানীরা।

—তারা আবার কি করলে?

—কি না করছে? চাল চিনি দেবে না, কয়লা দেবে না—এখন মরুক মানুষগুলো না খেয়ে। করে ত পরের ধনে পোদ্দারী, তা রকম দ্যাখো মিন্‌ষেদের?

—তাতে তোমার রাগ কেন? তোমার ঘরে ত চাল চিনির অভাব নেই? নিত্য যুঁইয়ের মত শুভ্র ভাত খাচ্ছি আর বর্ণে-গন্ধে পাগল করা সুস্বাদু চা চার কাপ করে নিত্যিই পাচ্ছি।

—কাল থেকে যুঁইয়ের মত ভাতও খাবে না, চায়েও সোয়াদ পাবে না—সরু চাল আর দোবরা চিনি, ছুই বাড়ন্ত। কণ্ট্রোল-ওয়ালাদের ঢাকের আওয়াজ পেয়েই তিন মাসের যুগ্‌গি চাল-চিনি ধরে রেখেছিলাম। এ্যাদ্দিন তাতেই চল্‌লো।

—এখন থেকে কণ্ট্রোলের চাল-চিনিতে চালাও।

—তুমি ত হুকুম করেই খালাস! কণ্ট্রোলের চাল ত চাল নয়, এক একটি দানা যেন কাশীর কুল। আর ইয়া ইয়া ইট-পাথরে ভর্ত্তি। পারবে গিলতে?

—তাই ত!

—পারবে না যদি, বেরিয়ে পড় এখুনি চালের যোগাড়ে। নইলে কিন্তু দু'বেলাই আটা বরাদ্দ হবে। চা-খাবার এনে দিচ্ছি, খেয়েই চট্‌ করে বেরিয়ে পড়।

মৃদুলা বলে কি? পাড়ার ডাক্‌সাইটে আলসে আমি, আমি করবো চালের যোগাড়! সভয়ে নরমতম সুরে বললাম,—আমাকে আর হাঙ্গামায় জড়াচ্ছো কেন? ঠাকুর-চাকরকে বলো গে।

—তবেই হয়েছে! ঠাকুর-চাকর করবে চালের যোগাড়?

ঝাঁজের সঙ্গেই বললাম—না, তারা কেন করবে? আমি বেটা ছুটি কাবুল-কান্দাহারে খাঞ্জা-খাঁদের জন্যে বাসমতির যোগাড়ে।

—কী মুস্কিল! তোমাকে বোঝানো শিবের অসাধ্যি! খাঞ্জা-খাঁরা আর ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো এই মৃদুলা বরাবর কণ্ট্রোলের চালই খাচ্ছে। বাসমতি চাই সাংখ্যের পুরুষটির জন্যে। বুঝলে?

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে বললাম—বুঝলাম ত; কিন্তু কোথায় যোগাড় করি?

—কেন, যেখানে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল-মোক্তার, উজির-ওমরাহরা করবে?

অঁ্যা! তাইত, মৃদুলা যে গর্ভনীয়-গিঁটটি বে-মালুম খুলে দিলে! উল্লাসের সঙ্গেই বললাম—ঠিক বলেছ, এত বড় সহজ কথাটা এতক্ষণ ঢোকেনি আমার মাথায়। যাও লক্ষ্মীটি, চট্ করে চাটা নিয়ে এস তো। খেয়েই বেরিয়ে পড়ি।

চা-পর্ব্ব শেষ হতেই দশ টাকার পাঁচখানা নোট এনে হাতে গুঁজে দিয়ে মৃদুলা মধুর মত মিষ্টি গলায় বললে—পার যদি চিনিও কিছুটা এনো। জামা-কাপড় বদলিয়ে, নোটগুলি কোঁচড়ে গুঁজে ঘরের কোণ থেকে লাঠিগাছটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

## তিন

বাড়ীর দুয়ারেই ট্রামের লাইন—উত্তর-দক্ষিণে। শীতের অপরাহ্নে ক্লান্ত-কেরাণী বোঝাই গাড়ীগুলি চলেছে উত্তরে—মন্থর ভাবে; আর দক্ষিণেরগুলি চলেছে খোস-পোশাকী ফটিকচাঁদদের বুকে তুলে নিয়ে —রেস্তোরা সিনেমা আর খেলার মাঠের দিকে। সবগুলিতেই আসনস্থদের চেয়ে "পদস্থদের" সংখ্যাই বেশী। তা হলেও সংখ্যা-গরিষ্ঠরাই চলেছেন গাড়ীর অন্দরে দাঁড়িয়ে—পরস্পর ধরাধরি করে টাল সামলাতে সামলাতে, আর লঘিষ্ঠরা চলেছেন অপিসের বড় সাহেবের মত ঋজুপৃষ্ঠ হয়ে বসে। আর একদল যাত্রী যাঁদের "আকাশস্থ" বলা যেতে পারে, তাঁরা চলেছেন অনেকটা বাদুড়েরই মত ঝুলতে ঝুলতে গাড়ীর আশে-পাশে, পেছনে। পথের ছোটদের দল ত নারিকেল-কাঁদির মত যাত্রীজড়াজড়ি ট্রামগুলিকে দেখে রূপকথার ডামলিং আর সোনার পালক-আলা রাজহাঁসের কথা মনে করে হেসেই কুটিকুটি।

ভিড়ের জন্যে কয়েকটা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে কম ভিড়ের একটায় উঠে পড়লাম। উঠে কি বিভ্রাটেই পড়া গেল। প্রথমেই একজনের ছাতার বাঁটে লেগে পাঞ্জাবীর পকেটটা ফেঁসে গেলো, চশমাটা নাসিকাচ্যুত হতে হতে রক্ষা পেলে। 'দুত্তর' বলে নেমে পড়লাম। সম্মুখেই মার্কেট, ভাবলাম একটিবার দেখেই যাই না ঘুরে। সড়ক পার হয়ে বাজারে ঢুকতেই দেখলাম দোকানে দোকানে ডাল, তেল, নুন, মসলা সবই আছে এন্তার—নেই কেবল চাল আর চিনি। একজন বুড়ো দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কত্তা সরু চাল কোথায় পাবো ?

দোকানী হুঁসিয়ার লোক। নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিলে—চাল কোথায় যে পাবেন ? সরু আর মোটা, এক দানাও কারো দোকানে নেই।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কোথায় গেলে পাবো বলতে পারো ?

—না বাবু, তবে বড়বাজার, বেলেঘাটা অঞ্চলে খোঁজ করে দেখতে পারেন।

বড়বাজার, বেলেঘাটায় চালের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসে ফুট-পাতে দাঁড়ালাম। দোকানের প্রদর্শন-বাতায়নে নজর পড়তেই চালের স্বপ্ন ছুটে গেলো। দোকানে দোকানে বস্ত্র-বিলাসের কী বিপুল আয়োজন। সোনা-রূপার জরির শাড়ি, জ্যাকেট ব্লাউজ, রূপের জেল্লায় চোখ যেন ঝলসে দিচ্ছে। এই আকালের

দিনে, যুদ্ধের বাজারেও বিলাসোপকরণের কি অসম্ভব চাহিদা। দোকানে দোকানে স্ত্রী-পুরুষ ক্রেতাদের কি ঠাসা-ঠাসি, ঠেলা-ঠেলি! সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। দিনান্তদীপ্তির হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে—রাস্তার বুকে এখানে-সেখানে, বিদ্যুদালোকের অভাবের দিনে এই সন্ধ্যারাগটি যে কি মধুর, তা ভাষায় আঁকবার নয়—শুধুই অনুভবনীয়।

বেলেঘাটা যাবো মনে ক'রে ট্রামের আশায় নার্শারীর সো-রুম সুমুখে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম কম হলেও দেড় ডজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ট্রামের প্রতীক্ষায়; দু' চারজন ক্লান্ত হয়ে ফুটপাতের ওপরই উবু হয়ে বসে পড়েছে। অথচ এত লোকের বাঞ্ছিত সেই দুর্লভ যানটির দীপালোকের ইসারাটি পর্য্যন্ত ধরা দিচ্ছে না সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিপথে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারও বিরক্তি ধর্‌ছিল, এমন সময় পটুয়াটোলার উকিল বন্ধুটির কথা মনে পড়ে গেলো। বন্ধুটি যেমন চৌকস, পসারও জমিয়েছেন তেমনি। দশ বছরও হয়নি প্র্যাক্‌টিস করছেন, এরি মধ্যে নিজের বাড়ী ও গাড়ী করেছেন। বন্ধুদের আকাঙ্ক্ষা আর শত্রুর আশঙ্কা আর দশ বছরের মধ্যেই জজিয়তির তক্তে বসবেন। ভাগ্যক্রমে বাড়ীতেই পেলাম। মামুলি দু'চার কথা বলেই জিজ্ঞাসা করে বসলাম—তোমরা চাল পাচ্ছো কোথায় বলতে পার?

একটুও ইতস্ততঃ না করে বন্ধুবর সহাস্যে উত্তর করিলেন—কেন, নিজের ঘরে?

—নাও, এও একটা কথা হলো?

—নয় কিসে ? বাজারে চাল নেই, কন্‌ট্রোলের চাল আমার য়্যালসেসিয়ান "বাণী"ও মুখে তোলে না। অথচ যাদের টাকা আছে, তারা সকলেই দু'বেলা ভরপেটে খাচ্চে। ঘরে চাল না থাকলে বেঁচে আছে কি করে ?

—এ তোমার মন্দ যুক্তি নয়! এরূপ প্রশ্নবিপর্য্যয় উকিল কৌন্সিলীরাই ঘটাতে পারে।

—সহজ উত্তরই দিয়েচি, তুমি বিশ্বাস না করলে কি করবো বলো ?

—উকিলি সিকেয় তুলে রাখো ; এখন চট্‌পট্‌ চালের হদিসটা দিয়ে দাও।

—কী মুস্কিল! সত্যি বলচি, ঘরের চালই খাচ্ছি ? তোমার বান্ধবী পাকা ম্যানেজার! আখেরী ভেবে ছ'মাসের যুগ্‌গি চাল, চিনি, কয়লা—সবই যোগাড় করে রেখেছিলেন।

ভারি ত বললে! সে ত তোমার বান্ধবীও রেখেছিলেন—তিন মাসের যুগ্‌গি, ফুরিয়ে গেল যে!

—ফুরিয়ে যেতে দিয়েই ভুল করেছে।

—খরচ হচ্ছে, সঞ্চয় নেই—ফুরোবে না ত কি ?

—খরচ ত আমাদেরও হচ্ছে, কিন্তু ফুরোয় না।

—তোমার ভাঁড়ারটি তা হলে একটি কূয়া-বিশেষ—দিনের খরচ-করা জল রাতারাতিই আবার আমদানি হয়।

বন্ধুটি হাসিয়া বলিলেন—দেয়ার ইউ আর! ঠিক ঠাওর করেছ।

—উকিল হয়েও তা হলে মজুতদার তুমি?

—হ'লেও রুই কাৎলা নই—নেহাতই চুনো-পুঁটি।

—বেশত, আমি না হয় কুচো চিংড়িই হবো। সন্ধানটি বাৎলে দাও।

বন্ধুটি সভয়ে পর্দ্দা-আঁটা একটা ঘরের দিকে চেয়ে—(আজকাল অন্দর অচল) কাণের কাছে মুখটি এনে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বললেন—শ্যালক শ্যামাচরণের এক বন্ধু রেশন-শপের মালিক। এবার ত বুঝলে ব্যাপারখানা?

—বুঝলাম, কিন্তু বড্ড দেরীতে। সে ডাক্তার এলেই, কিন্তু খাটিয়ার সঙ্গে। শালাই নেই, তা আবার তার বন্ধু!

—যা হোক করে, একটা যোগাড় করো না? সহধর্ম্মিণীর সহোদরের অভাবে একটা ভিন্নোদরই না হয় খুঁজে নাও। ইলিশ মাছের অভাবে তার গন্ধেই থালা-থালা ভাত উঠে যায়। শালার অভাবে শালার গন্ধও যার গায়ে আছে তাকে পেলেও দেখবে ব্যাপার কেমন সুন্দর ফয়সলা হয়ে যায়।

—তা' হলে চললাম ভাই?

—তা যাও; আমার বাপ-ঠাকুরদা প্রায়ই একটা অসার উক্তি করতেন। সেটা হচ্ছে—অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরনন্দনং। তোমার বান্ধবী বাড়ী না থাকলে আমিও শ্লোকটা আওড়াই। পার ত এই মহাজন-বাক্যটি মুখস্থ করে রেখো।

—তাই রাখবো।

বন্ধুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডে এসে দাঁড়ালাম, যেখানে ট্রাম থামে। সন্ধ্যা উৎরে গেছে; আজ আর বেলেঘাটা গিয়ে কোন কাজ হবে না। তার চেয়ে বরং বড়বাজারে মিনিষ্টার বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করে যাই, চাই কি চালের একটা সুরাহা হয়েও যেতে পারে। শিয়ালদার দিক থেকে ট্রাম আসতে উঠে পড়লাম এবং কলাবাগানের বস্তি ছাড়িয়ে একটা গলির মোড়ে নেমে পড়লাম। বন্ধুর বাড়ীর দুয়ারে গিয়েই দ্বিধা উপস্থিত হল, ভিতরে যাই কি, না যাই। এক সঙ্গে আই, এ পর্য্যন্ত পড়ি, আর এই বিদ্যাটুকুর দৌলতেই বন্ধু এখন বাদসাহের উজীর। এক সময়ের সহপাঠী হলেও আমার মত ছা-পোষা লোকের পক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছাটা নেহাৎই দুঃসাহসের পরিচয়। তা' হো'ক গে—ভয় ভাবনা ছুড়ে ফেলে ঢুকে পড়লাম বাড়ীতে। দেখা হলো। তবে সে যেন অনেকটা নীচের প্রতি উচ্চের অনুগ্রহেরই মত। চিনতেও পারলেন, একটু হেসে অনুগৃহীত করলেন; কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ কি আতিথেয়তার আমেজ ছিল না—ছিল বিস্ময়, সংশয়, আর সন্দেহ। হাসির সঙ্গে অঙ্গের একটা অপরূপ ভঙ্গি করে—বৈষ্ণবের ভাষায় 'ত্রিভঙ্গ' হয়ে মুরুব্বিআনা ঢংয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে চাটুয্যে, এ্যাদ্দিন পরে কি মনে ক'রে?

বন্ধুর ধরণ-ধারণে আমি ত তেতেই উঠেছিলাম। ভাবলাম বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে বের হয়ে যাই হন হন করে। কিন্তু পরক্ষণেই

সুবিধাবাদীর মতই অসৌজন্যটা হজম করে বললাম—হ্যাঁ ভাই, অনেক দিন পরেই এলাম—বড্ড দায়ে পড়ে।

একটা অদ্ভুত বিকৃত সুরে মন্ত্রী মহাশয় বললেন—তাইত আসছে সকলে; কিন্তু সে কথা স্বীকার করে না। যেন আমাকেই অনুগ্রহ করতে এসেছে এমন একটি ভাব দেখিয়ে. এ কথা সে কথার পরই পাড়ে আসল কথাটি—শালা কি ছেলের চাকরী বা ঠিকাদারীর উমেদারী।

—আমি ওসবের জন্যে আসিনি। আমি এসেছি তোমার কাছে—বাক্য জিহ্বাগ্রে এসেই হোঁচট খেয়ে থুবড়ে পড়লো মন্ত্রীর মুখে ভাবান্তর দেখে। শাণিতবুদ্ধি না হলেও বেশ বুঝতে পারলাম, আমার ঘরোয়া ঘনিষ্ঠতায় তাঁর সরকারী ও সামাজিক পদমর্য্যাদার গৌরব সুরক্ষিত না হওয়ায় তিনি দস্তুরমতই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। একটু খন্‌খনে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—তবে তুমি এসেছ কিসের জন্যে?

—চালের জন্যে।

—চালের জন্যে? আমার কাছে?

মন্ত্রী বেচারার চোখ-মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে ভয় হলো, বুঝি বা বিস্ময়ে, বিরক্তিতে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে সস্তা-শতরঞ্চ পাতা গৃহতলে।

একটু রগড় করবার মতলবেই বললাম—হাঁ ভাই, চালের জন্যে, আর তোমারই কাছে। ঘরে চাল বাড়ন্ত; বাজারেও অঘট। রূপ-কথার আমলে টাকায় বাঘের দুধও মিলত; কিন্তু তোমাদের

উজিরী আমলে টাকায় চালও মিলে না।

মন্ত্রী মহাশয় ঈষতুষ্ণ হয়ে বললেন—কেন মেলবে না? রেশন-কার্ড যাদের আছে তাদেরই মিলছে।

—তা ত মিলছে; কিন্তু চালের নামে যে-বস্তুটা মিলছে, সেটা খাদ্য কি না সে খবর রাখো?

—তা কেমন করে রাখবো?

—তা' যদি নাই পারবে, তবে অত ঠাট-ঠমক করে অমন একটা বে-খাপ্পা আইন খাড়া করলে কেন?

—সময়ের আর সমরের চাপে।

একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম—তা যেন বুঝলাম; কিন্তু সরমের চাপ বলে কি কিছুই নেই জগতে? কণ্ট্রোলের চাল জানোয়ারেরও অখাদ্য।

—তা হতে পারে, কিন্তু রেশন-কার্ড জানোয়ারের নামে 'ইস্যু' হয়নি, হয়েছে জনাবদেরই নামে। তাঁরা নিচ্ছেনও খাচ্ছেনও; নইলে শহরের দৈনিক মৃত্যু-তালিকা রবিবারের ষ্টেটসম্যানেও কুলোত না।

নাঃ, লোকটার হৃদয় বলে কোন জিনিষই নেই—শুধু হাড় আর মাংসের স্তূপ। কথার সুরে একটু বিরক্তির খাদ মিশিয়ে বললাম—জনাবরা ত নিচ্ছেন; কিন্তু তুমি নিচ্ছো, তুমি খাচ্ছো?

—নিচ্ছি বই কি? তা' নইলে কাঙাল-গরীবকে দু'মুঠো দিচ্ছি কি করে? হ্যাঁ, তবে খাচ্ছি না।

—তবে কি চাল খাচ্চো?

—দাদখানি, কালজীরে, কাশ্মীরি!

—কোথায় পাচ্চো?

মুখে হাসির হাওয়া ছড়িয়ে মন্ত্রী মহাশয় বললেন—সে আমি হলপ করে বলতে পারবো না। ও আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়—মিসেস মন্ত্রীর। চালাচ্ছেনও তিনি বেশ তোফাই।

—তার মানে তোমরাও মজুতদার!

—ঐখানেই তোমার ভুল। মজুতদার তারাই, যারা সস্তাদরে মাল ধ'রে উঁচুদরে ছাড়ে।

—বেশ ত আয়ত্ত করে নিয়েছ কথার কায়দা-কৌশল?

—না নিয়ে কি করি? আমি ত আর তোমাদের খতুবাহারী মন্ত্রী হ'তে চাইনে, আমার দৃষ্টি কায়েম-মোকররী মন্ত্রীত্বে। কাজেই কথায় পাকা-পোক্ত না হ'লে চলবে কেন? কবজি ঘুরিয়ে হাত-ঘড়িটায় নজর বুলিয়ে নিয়ে—কি হে, বসতে চাও নাকি?

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপের পর "বসতে চাও না কি?" মানেই—নিকালো। ইঙ্গিত-ইসারা নয়, স্পষ্ট আদেশ। টের পেয়ে আমিও বললাম—না, বসে আর কি করবো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ত বেশ চললো এতক্ষণ। আচ্ছা, তা হলে চললাম।

হাত-ঘড়িটায় আর একবার ট্যারচা ভাবে চেয়ে নিয়ে—তা' এসো। আমাকেও এখুনি ছুট্‌তে হবে লাটের বাড়ী—ডিনারে।

একরকম ছুটেই হ্যারিসন রোডে এসে নিঃশ্বাস ছেড়ে পুনর্জীবন লাভ করলাম। চতুর্থী কি পঞ্চমী হবে; আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একফালি চাঁদের আবছা হাসিতে যতদূর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখলাম ট্রাম আসবার কোন লক্ষণই নেই। বৃথা ট্রামের আশায় সময় নষ্ট না ক'রে হেঁটেই চললাম কলেজ ষ্ট্রীট বরাবর। খানিকটা এগুতে না এগুতেই দেখলাম বাঁ হাতে একটা গলির মোড়ে ফুটপাথ ঘেঁষে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীটাকে পেছনে ফেলে গজটাক এগিয়ে যেতেই শুনলাম—নীলমাধব বাবু, অ-মশায়, শুনছেন? শুনছিলাম ঠিকই—আমাদের পল্লীর চারু ডাক্তারের গলা। ফিরে এসে, মোটরের সুমুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তার যে! য়্যাদ্দূরে 'কল' পাও! বাঃ! বেশ ত জমিয়েচ প্র্যাক্‌টিস? মোটরও কিনেছ দেখছি! প্রশংসায় খুসি হয়ে গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরে বললে—বাড়ী যাচ্ছেন তো? উঠে পড়ুন,—আমিও বাড়ী ফিরছি।

শীতের রাত্রে নিষ্প্রদীপতার আবছা অন্ধকারে হুঁচোট খেতে খেতে পথ চলতে গিয়ে ডাক্তারের আহ্বানটা অনেকটা দেব-প্রেরিত মনে করে যেই উঠতে যাচ্চি, অমনি ডাক্তার—'সাবধান, দেখে উঠুন' বলেই টর্চ্চটা জ্বেলে ধরলো। দেখলাম গাড়ীর খোলে তিনটে বস্তা পড়ে আছে। প্রশ্নের দ্বারা রহস্যটাকে খোলসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চারু ডাক্তার "চুপ করুন" বলেই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন। এই

সময় 'সোফার' আর দরোয়ান গোছের একটা জোয়ান লোক আর একটা বস্তা ধরাধরি করে এনে গাড়ীতে তুলে দিলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা মায়িক ব্যাপার ঘটে গেল। দরোয়ান গা' ঢাকা দিয়েছে, সোফার তার আসনে, আর মোটর চলছে হু হু করে ছুটে কলেজ ষ্ট্রীট মুখে। এবার ডাক্তার মুখ খুললে, বললে—একটু হলেই একটা কাণ্ড বাধিয়েছিলেন আর কি?

—কাণ্ড বাধিয়েছিলাম কি রকম?

—বাধাচ্ছিলেন না? অমন জায়গায় কি চোরাই কারবারের আলোচনা চলে? অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গোয়েন্দা-পুলিশ কোথায় ওঁত পেতে আছে, তার কিছু ঠিক আছে?

—ডাক্তারী করো তাই জানি, চোরাই কারবার কর জানলে কি আর সারা বাজার ঘুরে মরি, না ছুটোছুটি করি উজীর-ওমরাহের বাড়ী।

—আপনার কি দরকার শুনি?

—দরকার ত কত কিছুরই। আপাততঃ কিছু সরু চাল আর দোবরা চিনি হ'লেই চলবে।

—বেশ ত, নিন না: চাল চিনি দুই-ই আপনার সুমুখে পড়ে রয়েছে।

—বলো কি? এগুলো চাল-চিনির বস্তা?

—হ্যাঁ, কত চাই?

—পরিমাণ ত কিছু বলে দেননি গিন্নী, শুধু দশ টাকার পাঁচখানা নোট দিয়েছেন। হ্যাঁ, তবে চালটা বেশ সরু হওয়া চাই।

—তা হ'লে কেনা দরেই দিচ্চি এক বস্তা খাঁটি কাশ্মীরি চাল। আর এক বস্তা চিনি।

—বাঁচালে ডাক্তার। নাও এই পঞ্চাশ টাকা। গুনে দ্যাখো। ডাক্তার টর্চ্চের আলোয় নোটগুলি বেশ করে দেখে পকেটে রেখে দিলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মোটর এসে আমার বাড়ীর দোরে থামলো। ঠাকুর-চাকর ডাকতে যাচ্চি—ডাক্তার ডাকতে দিলে না। নিজে আর সোফারে ধরাধরি করে দুটো বস্তা নামিয়ে দিয়েই মোড় ফিরে গ্রে ষ্ট্রীটে ঢুকে পড়লো। মোটরের শব্দ পেয়েই মৃদুলা সদরে হাজির। তার আদেশে ঠাকুর-চাকর চাল-চিনির বস্তা নিয়ে ওপরে চলে গেলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে কি উদ্দাম আনন্দ মৃদুলার। শুধু কি আনন্দই? গরবে যেন ফেটে পড়ছে! পড়শীদের উদ্দেশ করে বললে—এখন দ্যাখ না এসে, গাধা বানিয়েচি কি সিংগি বানিয়েচি। যত সব হিংসুটের দল।

চাল-চিনির অমন নাদুস-নুদুস বস্তাগুলি দেখে মৃদুলার আর তর সইল না—বস্তা খুলতে বসে গেলো। একটার মুখ খুলতেই আনন্দে চীৎকার করে উঠল—বাঃ! কি সুন্দর ধবধবে চিনি! তবে দোবরা নয়, তা হোক গে। যা পেয়েচি এতে কাজ চলে যাবে।

দ্বিতীয় বস্তটাও খোলা হলো, খুলেই মৃদুলা চীৎকার করে

উঠলো—ও মা! এ কি এনেছ? চাল কৈ? এ যে ষই!

আমিও আঁৎকে বললাম—যই?

কোন উত্তর না দিয়ে, এক চিম্‌টি চিনি মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করে বললে—সোডা। যা রটে, কিছু ত বটে। ধাতে গাধা কি সিংগি হয়?

# যোগাযোগ

(১)

আমার প্রতিবেশী করালীকৃষ্ণ কর ওরফে কালীকৃষ্ণ কর এম্-এ'র পিতা ছিলেন করপোরেশানের কর-সংগ্রাহক। যে ছেলে একদিন হাকিম হয়েছিল সে যে বিদ্বান ছিল ইহা নিঃসন্দেহ। বিদ্বান পুত্রের পিতা যে, যাকে-তাকে বেয়াই বলে কোল দিতে কিংবা সামান্য পাঁচ-দশ হাজারের জন্যে নিজের ছেলেকে 'পর' করতে পারেনা, তা' সকলেই 'এক'বাক্যে না হলেও 'বহু'বাক্যে স্বীকার করতেন।

'পর' এই শব্দটির টিপ্পনী করতে গিয়ে কুলুক ভট্টের প্রিয় শিষ্য উলুক ভট্ট কি বল্ছে শুনুন :---ছেলের বিয়ে দিলে গুণধর পুত্র দু'দিন যেতে না যেতেই বৌ'মার বাপকে বাবা ডেকে পরের ছেলেই হয়ে পড়ে। মেয়ের বিয়ে দিলে কিন্তু ব্যাপারটা হয় উল্টো; নিজের মেয়ে নিজেরই থাকে অথচ পরের ছেলেটি ফাউ পাওয়া যায়। তার মানে—আমে-দুধে এক হয়, আঁদাড়ের আঁটি আঁদাড়ে যায়। আর এই জন্যেই বাংলার মেয়েরা গর্ব্ব করে বলেন—দশপুত্র সমকন্যা যদি পাত্রে পড়ে।

কোন এক সুপ্রভাতে করালীকৃষ্ণ একটা ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বস্‌লেন—দানে ও নগদে পনরটি হাজার হাতের মুঠোয় না পেলে নিজের হীরের টুক্‌রো ছেলেকে পরের মুঠোয় তুলে দেবেন না। তাই করালীকৃষ্ণ টোপ্‌ ফেলে রুই-কাৎলা জাতীয় একটা মেয়ের বাপকে খেলিয়ে তোলার মতলবে কিছুদিন থেকে ফন্দি আঁটছিলেন, কিন্তু তার ধনুক-ভাঙ্গা পণের কথা শুনে চুনোপুঁটি কা কথা, অনেক রুই-কাৎলা চাঁইরাও ঘাই মারতে সাহস পাচ্ছিল না।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—If to-day will not, to-morrow may—আজ যাহা না হইল—হতে পারে কাল। করালীর কপালেও তাই ঘটলো। অসমীয়া জমিদার বসন্তবিলাস বড়ুয়া তাঁর ম্যাট্রিক-পাশ কুমারী কন্যা রেবারাণীকে কলেজে পড়াবার জন্যে কলিকাতায় এসে করালীর আর আমাদের মাঝখানের বাড়ীটা ভাড়া নিলেন।

আমাদের আর বসন্তবিলাসের ভাড়াটে বাড়ীর মাঝখানে একফালি সরু গলি মাত্র ব্যবধান—এত লাগালাগি বাড়ী দু'টি যে দেখে, মনে হয় যেন এক বাড়ীর আল্‌সে অপর বাড়ীর আল্‌সেকে চুমো খাচ্ছে। বসন্তবিলাসরা বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই মৃদুলা ছাদে গিয়ে একলাফে গলিটা ডিঙ্গিয়ে রেবারাণীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এলেন। এসেই ছোট চোখ দু'টি বড়করে বল্‌লেন—ওগো শুনচ, পাশের বাড়ীতে এক মস্তবড় লোক এসেচে। সঙ্গে ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে আর পরীর মত গিন্নী। এক রাজ্যের মালপত্তর সঙ্গে! ঐত বাড়ী, এতসব রাখ্‌বে কোথায়?

—সে ভাবনায় আমাদের কাজ কি?—আমি হেসে বল্লাম। মৃদুলা কোন উত্তর না দিয়ে জানালার পাখী খুলে নূতন ভাড়াটেদের নূতন সংসার পাতা দেখ্তে লাগলেন।

আমাদের পড়শী করালীবাবু আর যাই হো'ক কথায় কৃপণ ছিলেন না। দু'দিন না যেতেই গায়ে-পড়া হয়ে বসন্তবিলাসের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। করালীপত্নী সৌদামিনীও একদিন বসন্তবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশুনা করে এলো। স্ত্রী বাড়ীতে ফিরতেই করালীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কিগো কেমন লাগলো জমিদার-গিন্নীকে?

—কেমন আবার লাগবে?—হেসে জবাব দিলে সৌদামিনী। জমিদার-গিন্নীরা যেমন হয়ে থাকে তেম্নি। আবার কি?

—তার মানে?

—বুঝে নাও।

—দেমাকে বুঝি?

—দেমাকে বলে, ঠেকারে পা' মাটিতে পড়তে চায় না। কী কথাটাই না কইতে পারে। মুখত নয় যেন একখানা খই-ভাজা খোলা।

করালী হেসে বল্লেন—তোমার গায়েও জমিদার-গিন্নীর বাতাস লেগেছে দেখ্‌চি।

—মরণ আমার! আমি নাকি অমন সাজ-গোজ করে দোকানের পুতুলটি সেজে থাকি! ছিঃ!

—পরের সাজ-গোজ দেখলে মেয়েদের হিংসার অম্বলে বুকজ্বালা করে।

—আর পুরুষদের বুকে সুখের ফোয়ারা ছোটে!

—ও-সব কথা থাক এখন, কিরকম আলাপ-সালাপ হলো শুনি?

—শুধু আলাপই হলো; সালাপ করবার ফুরসৎ পেলাম কই! জমিদার-গিন্নীর নিজের কথাই পাঁচকাহন। তার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে অনেক মেয়ে-পুরুষই নাকি বি-এ, এম্-এ পাশ করেচে, শ্বশুর-গোষ্ঠীর মধ্যে তার রেবারাণীই এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি ডিঙালো।

—রেবা, সেও মায়ের মত ঠেকারে নাকি?

ফাঁদালো নথে নাড়া দিয়ে সৌদামিনী বল্‌লে—নাগো না, বড্ড ভাল মেয়ে রেবা; যেমন রূপে, তেমন গুণে। আমায় দেখতে পেয়েই পা' ছুঁয়ে পেন্নাম করলে, কত সমিহ করে নিয়ে গিয়ে বসবার ঘরে বসালে! গিন্নী ছেলো ওপরতলায়—ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে এলো। ভা-রী ভালো মেয়ে গো। অমন একটি মেয়ে পেলে আজই কালীর বৌ'করে ঘরে আনি। লক্ষ্মী-পিরতিমে—সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগেই আছে।

স্ত্রীর মুখে অমন প্রশংসার বাণ ডাকতে দেখে করালীর বুক কেঁপে উঠলো, পাছে বিনাপণেই রেবাকে বৌ আন্‌তে জীদ করে। তাই উপেক্ষার স্বরেই বল্‌লে—কি যে বলো। অমন মেয়ে শ'য়ে শ'য়ে পড়ে আছে ঘাটে পথে; কিন্তু পনরহাজার দেবার ক'জন আছে?

সৌদামিনী দ্বিতীয়বার নথ নাড়া দিয়ে বল্‌লে—তোমার ঐ এক

কথা—পনর হাজার। পণ নিয়েই বসে থাক। ছেলের বিয়ে দিও না।

—ভদ্রলোকের এক কথা গিন্নী।

—কেউ যদি বার হাজার দিতে চায়?

—বার হাজার কি বলচো? চৌদ্দ হাজার ন'শ' নিবানব্বুই পণর আনা এগার পাই দিলেও নয়। হুঁ!

—তবেই হয়েছে কালীর বিয়ে। আমার কপালে 'বিধেতা' ছেলে-বৌ নিয়ে করকন্না লেখেনি।

—বিধাতা না লিখে থাকেন, আনো কালি-কলম আমি লিখে দিচ্ছি—এই রেবার সঙ্গেই কালীর বিয়ে হবে। অমন শাঁসালো জমিদার—পনর হাজারত বসন্তবাবুর হাতের ময়লা।

স্বরে একটু বিষণ্নতা মাখিয়ে সৌদামিনী বল্লে—কলকাতায় কি টাকাওয়ালার আকাল পড়েছে? কত সম্বন্ধইত এসেছিল; টাকার থাইটা একটু কমালে কালীর বিয়ে হয়ে যেতো। কত ভাল ভাল বিলেত-ফেরতা ছেলে থাকতে কালীকে এত টাকা দেবে কেন?

—দেবে গো দেবে; বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, রূপ-গুণে অমন আর একটি পাবে কোথায়? ইউনিভার্সিটীর তরফ থেকে ডেপুটির সুপারিসটা এই বের হলো বলে। তখন মার দেগা কেল্লা। হুঁ!

সৌদামিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে—আর হয়েছে কালীর বিয়ে!

—হবে, নিশ্চয় হবে, হয়েই রয়েছে মনে কর। চল্লিশ পেরুলে

কি হবে এখনও আমার চোখে চাল্‌শে ধরেনি। দেখতে পাচ্ছ তোমার ছেলের ওপর নজর পড়েচে।

—ওমা, সে আবার কি গো! কোন ডাইনীর আবার নজর পড়লো?

—ডাইনী নয়—বাসন্তী।

—সে আবার কে গো?

—বসন্তবাবুর স্ত্রী।

—তার ওনাম নয়—তার নাম মালতী।

—বসন্তের স্ত্রী বাসন্তীই ব্যাকরণ-সম্মত। তোমার নামও সৌদামিনী না হয়ে করালিনী হওয়া উচিত ছিল। এমন সময় কালীকৃষ্ণ এসে খবর দিয়ে গেলো—বসন্তবাবু এসেচেন। শুনে করালীর বুকটা কোলাবেঙের মত একটা লাফ দিলে—আনন্দে। স্ত্রীকে বল্‌লেন—নিশ্চয়ই বিয়ের কথা পাড়তে এসেচে। যাও গয়না-গাঁটির ফর্দ্দ করোগে আমি বাইরে চল্‌লাম।

(২)

হেদোয় বেড়িয়ে বসন্তবাবু যখন বাসায় ফিরলেন তখন সন্ধ্যে উৎরে গেচে। মালতীর সঙ্গে দেখা হতেই বল্‌লেন—বেড়িয়ে আজ সুখ হলো না। অন্যদিন সঙ্গে রেবা থাকে, তুমি থাকো—বেশ লাগে।

—রেবাত তৈয়েরই ছিল, আমিও পোষাক ঘরে ঢুকেছিলাম।

করালীবাবুর স্ত্রী এলেন কিনা, তাই তোমার সঙ্গে বেরুতে পারলাম না।

—থাকগে সে কথা। করালীবাবুর স্ত্রীকে কেমন লাগলো?

—বেশ পাকা গিন্নী, কথায়ও খুব খরখরে, কিন্তু ভা-রী জেঁকো। ছেলের গরবে মাটিতে পা' পড়ে না।

—জাঁক নয় বাৎসল্যের অতি-প্রকাশ। কিরকম ছেলে? হীরের টুক্‌রো।

—তা বটে, যেমন রূপ, তেমন গুণ। রেবার জন্যে পাওয়া যায়না ছেলেটি?

—এখুনি রেবার বিয়ে কি? বি-এ'টা পাশ করুক।

নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার গর্ব্বে সুললিত ভঙ্গী সহকারে—ঐত তোমাদের রোগ! আর এরি জন্যে কত মেয়েকে আজীবন আইবড় থাকতে হয়। এম্-এ, বি-এ পাশ-করা মেয়েরা এম্-এ, বি-এ পাশ ছেলে চাইবেত?

—তাই পাবে।

—হ্যাঁ, পাবে না আরো কিছু! ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারে হাজারে, এম্-এ, বি-এ ক'জনা পাশ করে?

—পকেটে টাকা থাকলে রেবার জন্যে এম্-এ, বি-এ'র অভাব হবে না।

—আর টাকার বড়াই করতে হবে না। টাকায়ই যদি সব হতো

তা' হলে তোমার এই মালতী আজ কড়েইবাড়ীর কড়ে-রাণী হতো। —গৌরহাটীর গেঁয়ো জমিদারের গিন্নী হতো না।—বলেই চোখের কোণে কৌতুকের ঝলক খেলিয়ে মালতী তার হাসি-হাসি মুখখানি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে নিলে।

বসন্তবিলাসও মুখে হাসির তরল একটি তরঙ্গ তুলে বল্‌লে—আহাহা, কি ভুলই করেছ নব্যা রুক্মিনী ঠাকুরুণ! বাপকে টাকার প্রলোভনে ভুলিয়ে যে রূপসীকে কিনে নিচ্ছিল কড়েবাড়ীর রাজা তার কনিষ্ঠ কুমারের জন্যে, তার চিত্ত কিনা হরণ করলে এক গেঁয়ো জমিদারের রূপের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ আর তার নামের বিলাসন!

বসন্তবিলাসের মুখ চেপে ধরে—থামো, থামো 'নর-সুন্দর' আর 'নাম-সুন্দর' মশায়। কবে কোন বোকামী করেচি সে পুরনো কাসুন্দি আর ঘাঁটতে হবে না। যা বল্‌চি শোন—রেবার বিয়েটা দিয়ে ফেলো। এমন ছেলে হাত-ছাড়া কোরো না।

—কথাটা বোধ হয় ঠিকই বলচো। বিলিতি প্রবাদ বলে—Marry your son when you will, your daughter when you can—ছেলের বিয়ে যখন খুশি দিও, মেয়ের বিয়ে যখুনি পার।

—তবে আর কথা কি? অমন ভাল নজির যখন আছে—দাও রেবার বিয়ে—বলে, মালতী একটু হাসলে।

—দেখি।

—আর দেখে কাজ নেই—এখানেই 'সম্বন্ধ' কর।

—দু'দিন সবুরই করো না; মেয়েত আর তোমার মত বিয়ে-পাগলী হয়নি?

মালতী একটু কপট কোপের প্রহসন করে বল্‌লে—থাক্‌গে, দিতে হবে না বিয়ে।

বসন্তবিলাস হেসে বল্‌লে—দিতেই হবে বিয়ে আর এই কালী-কৃষ্ণের সঙ্গেই। কারণ তোমার 'না' মানেই 'হ্যাঁ'। কি বলো?

মালতী এক ঝলক হাসির সঙ্গে—ইচ্ছে হয় দাও, কিন্তু দানে ও নগদে পনর হাজার—জান তো?

—জানি, এক পাই কমও নয়, বেশীও নয়! ভদ্রলোকের নাকি এক কথা!

—ভালইত। দরাদরি করাব চেয়ে একদরে ঢের সুবিধে।

—তা' হলে চলো একটিবার রেবার ঘরে।

—কেন? মত নিতে? আমি বলচি এ-ছেলে তার অপছন্দ হবে না।

—তবু চলো।

—বেশ চলো।

(৩)

করালীবাবু বসন্তবিলাসকে দেখেই যুক্ত-কর কপালে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে বসন্তবাবু, কতক্ষণ?

প্রতি নমস্কার করে বসন্ত বললে—এই খানিকক্ষণ; আপনার কাজের বিঘ্ন করলাম নাত?

—বিলক্ষণ, আমার আবার কাজ! হাতে পাঁজি দেখচি যে, ব্যাপার কি?

—আর বলেন কেন মশায়, গিন্নীর রোখ চেপেছে এই অঘ্রাণেই রেবার বিয়ে দিতে হবে।

শুনে করালীর বুকখানা আর একবার লাফ দিলে—আশঙ্কায়। কি জানি সম্বন্ধ যদি পাকাপাকী হয়ে গিয়ে থাকে। পাকা যাদুকরের মত মনোভাব গোপন করে কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে বললেন—অতি সুখবর; দেখবেন আমরা 'ইতর' জন যেন মিষ্টান্ন হতে বাদ না পড়ি। কোথায় ঠিক হলো?

—ঠিক হলো কি বলচেন? বি-এ পাশের আগে বিয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়; কিন্তু মালতী তেঁতুলের মত বেঁকে বসেচেন—বিয়ে দিতেই হবে।

—উনি যখন বল্‌চেন দিন না এই অঘ্রাণেই।

—পাঁজিতে দিন থাকলে না দিয়ে কি রেহাই পাবো? এখন কথা হচ্চে ছেলে যোগাড় করি কোত্থেকে?

—করালীর বুকটা তৃতীয়বার লাফ দিলে আশায়। একটু সন্তর্পণেই বল্‌লেন—ছেলের অভাব কি মশায়?

—অভাবত নেই জানি, কিন্তু একটা বে-খাপ্পা পণ করে বসেচি যে!

চমৎকৃত হয়ে করালী—কী মুস্কিল! আপনারও একটা পণ আছে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুনতে পারি কি?

—নিশ্চয়; আমার পণ—নগদে ও দানে ষোল হাজার দেব, এক পাই কমও নয়, বেশীও নয়।

—এত পণ নয়, এযে দেখ্‌চি টাকার চার! বরের বাজারে রৈ-রৈ কাণ্ড বাঁধাবেন দেখচি। বি-এ, এম্-এ, এম্-এসসি-রা হুড়মুড় করে ছুটে আসবে।

—আমি মশায় ও-সব পাশ-টাশের ধার ধারিনে। ছেলেটি সুন্দর আর বংশটি ভাল হলেই হলো। পারেন এমন একটি ছেলে যোগাড় করে দিতে?

করালীর বুকখানা আশায়, আনন্দে কেঁপে উঠ্‌লো; তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে—ছেলেত আমার ঘরেই আছে—হীরের টুক্‌রো—ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির জুয়েল, কিন্তু—

বসন্তবাবু লাফিয়ে উঠে করালীর হাত ধরে—আর কিন্তু-টিন্তু নয় মশায়, দিন আপনার কালীকৃষ্ণকে আমায়, অমন হীরের টুক্‌রো পেলে কি আর কাঁচভাঙ্গা খুঁজি?

—দিতেত পারতামই, কিন্তু আপনার মত আমারও যে একটা বে-খাপ্পা পণ আছে।

বসন্তবাবু মুখে দুশ্চিন্তার ভাব এনে—আঃ আপনার আবার কি পণ মশায়, সব মাটি করবেন দেখ্‌চি। শুনি পণটা?

—আমার পণ হচ্ছে—দানে ও নগদে যে পনর হাজার দেবে তারই মেয়ের সঙ্গে কালীর বিয়ে দেব। দেখুনত আমাদের কি পরস্পর বিরোধী পণ।

বসন্তবাবু চোখে বিদ্রূপের কৌতুকাঞ্জন মেখে—আপনারত ভালই হলো; পণও রক্ষা হলো ফাঁকতালে হাজার টাকা বেশীও পেলেন। দিন রেবার-কালীকৃষ্ণের বিয়ে।

—উঁহু, তা' হয় না—ভদ্রলোকের এক কথা।

বসন্তবাবু দুঃখিত হওয়ার ভাণ করে গম্ভীরভাবে— তাহ'লে আব কি করা যায়; পারেন কালীকৃষ্ণের মত আর একটি ছেলে যোগাড় করে দিতে?

—কালীর মত ছেলে যোগাড় করা কি চারটিখানি কথা, বসন্ত-বাবু? তার চেয়ে এক কাজ করুন—আপনি পনর হাজারই দিন—হোক রেবার সঙ্গে কালীর বিয়ে।

উঁহু! তা' হয় না—ভদ্রলোকের এক কথা।

—কী বিপদ! দু'জনই ভদ্রলোক হলে চলে কি করে? আচ্ছা একটু বসুন; চট্ করে জিজ্ঞেস করে আসি।

করালী অন্দরে যেতেই বসন্তবাবু কোঁচার খুঁট্‌টি মুখে চেপে খানিকটা হেসে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই সহাস্যে করালী এসে বল্‌লে—সাধে কি মশায় সাহেবেরা মেমদের এত খাতির করে? কী সূক্ষ্ম ওদের বুদ্ধি!

—তা' হলে ষোল হাজারেই রাজি, কি বলেন?

—উঁহু! কালীর মা বল্‌লেন, আপনি দানে ও নগদে পনর হাজারই দিন। আর রেবা তার শাশুড়ীকে হাজার টাকা দিয়ে প্রণাম করুক। দেখুন সমস্যাটা কেমন জল হয়ে গেলো।

উদ্‌গত হাসি চেপে গমনোদ্যত বসন্তবাবু করালীকে নমস্কার করে—তা'হলে আজ উঠি?

করালী নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে এই অগ্রাণেই পাকা হলো?

—কি করে বলি? আপনি ত কন্যের কাছে হাইকোর্ট পেয়ে নিজের 'কেস'টা ফয়সালা করে নিলেন। আমিও মালতীর 'বেঞ্চে' আরজি পেশ করিগে—রায় বের হলে জানিয়ে যাবো। এই বলে বসন্তবাবু বের হয়ে পড়লো।

* * *

অপূর্ব্ব যোগাযোগে শুভদিনে চারহাত এক হয়ে গেল।

# মারণ যজ্ঞ

করালীকৃষ্ণ যেদিন বসন্তবিলাসকে বৈবাহিক সম্পর্কে লতাইয়া আলিঙ্গন করলে সে থেকে পনরটি বছর কাল-সাগরে আত্মনিমজ্জন করেছে; আর জগতেও অনেক-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেচে। করালীর লোকান্তর হয়েছে, কালীকৃষ্ণ ডেপুটী হয়েচে। আমার চুল পেকেচে—পেনসান হয়েচে।

আরো অনেক-কিছু হয়েচে। কলকাতায় সিদ্ধবাবার আশ্রম হয়েচে, মৃদুলা সাধুমাকে ছেড়ে, ধ্যান-ধারণা ছেড়ে সিদ্ধবাবা ও রাধারাণীর অনুরাগিণী হয়েচে। আশ্রমে রাধারাণী একটি প্রাণবন্ত যন্ত্র বিশেষ। সেই হচ্ছে আশ্রম-গৃহস্থালীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ঝি-চাকর থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদের এবং সিদ্ধবাবার নিজের সুখ-সুবিধা যা-কিছু সবই তাকেই দেখতে হয়। সে যদি কোনদিন আশ্রমে অনুপস্থিত থাকে তা' হলে আশ্রম-তরণী মুহূর্ত্তেই বানচাল হয়ে পড়ে। কাজেই রাধারাণীকে আশ্রমেই থাকতে হয় দিন-রাত্রি। ফলে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত দ্বি-স্বরের মত অতুলানন্দকেও আশ্রমেই থাকতে হয়। অতুলানন্দ একাধারে রাধারাণীর স্বামী আর আশ্রমের অধ্যক্ষ দুই-ই।

রাত্রি প্রায় দশটা, বহিরাগত ভক্তরা সকলেই চলে গেচে। দাসপুরের জমিদার গোপীকারঞ্জন ভঞ্জের পত্নী বিভাবতী আশ্রমের 'ভালমা' অতুলানন্দের সঙ্গে যশোরেশ্বরীর পূজা দিতে কাশী রওনা হয়ে গেছেন। ঠাকুর-চাকর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাতি নিবিয়ে যে-যার ঘরে শুয়ে পড়েচে। আশ্রম-বাড়ীটির নীচে-উপরে একটা গভীর নীরবতা থম্-থম্ করছিল।

ঘড়িতে টং-টং করে এগারোটা বাজলো, দোতলার একটি ঘরের তুয়ার খুলে নীলাম্বরী পরণে রাধারাণী সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে এল। সিদ্ধবাবা তখন মুক্ত আকাশের তলে অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে গভীর ধ্যানস্থ। রাধারাণীর শুভাগমন হয়ত টেরও পেলেন। একটু পরেই একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আপনা-আপনিই বলে উঠলেন—মার যা আদেশ তাই করবো। পাপ-পুণ্যের দায়-দায়িত্ব তোমার মা। আমি যন্ত্র, তুমি মা যন্ত্রী—যথা নিযুক্তঃস্মি তথা করোমি—তুমি যা করাও, আমি তাই করি। চোখ মেলে রাধারাণীকে দেখে, অতি গাঢ়কণ্ঠে—রাধে শ্রীকৃষ্ণ ভজনই ভালো। অঙ্গটি ত্রিভঙ্গ হলেও অন্তরটি সরল। আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্য্যন্ত প্রভুব জীবনটি তিনভাগে বিভক্ত—ব্রজের কৃষ্ণ, গীতার কৃষ্ণ আর দ্বারকার কৃষ্ণ; কাজেই এঁকে চিনতে-জানতে কোন হাঙ্গামা নেই! কিন্তু রাধে ঐযে নৃমুণ্ডমালিনী কালো মা'টি ওঁকে চেনা জানা বড়ই শক্ত।

রাধারাণী সিদ্ধবাবার দিকে হাতখানেক এগিয়ে বসে আবেগভরা অধীরতায় প্রশ্ন করলে—মা কি আজও দেখা দিলেন না?

দিলেন বইকি রাধে, তবে কি জান, মা আমার জগন্মাতা তার অনন্ত রূপ, অনন্ত শক্তি, তাঁর মনের গতিও তেম্‌নি সমুদ্রতরঙ্গের মত অন্তহীন, আর বাবা মহেশের জটারই মত জটিল। তাই কখন যে মা তুষ্ট হন আর কখন যে রুষ্ট হন বোঝা কঠিন।

রাধারাণী আর একটু এগিয়ে, উদ্বেগাকুল কণ্ঠে—তবে কি হবে? যে করেই হো'ক গোপীকারঞ্জনকে জেল থেকে বাঁচাতেই হবে যে? জেল হলে কি 'ভালমা' শ'য়ে শ'য়ে টাকা দেবে আশ্রমে? আজও কাশী রওনা হবার আগে বলে গেলেন—কত্তা খালাস পেলে আশ্রম 'ফণ্ডে' দশ হাজার টাকা দেবো।

রাধে, তুমি কি মনে কর মাকে আমি সহজে ছেড়েচি। অনন্তরূপময়ী জগন্মাতা যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তিতে একটু আগে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর পূজা দেওয়ার জন্যে 'ভালমা'কে কাশী পাঠান হয়েছে জেনে মার মুখ প্রসন্ন দেখলাম।

মা প্রসন্না হয়েছেন জেনে আমিও খুশি হলাম। মা কি বল্‌লেন।

—মা বল্‌লেন, বৎস আমাকে পূজা দিয়ে কোন লাভ নেই; খুলনা এখন যশোহরের অন্তর্গত নয়—আমার এলাকার বাইরে। আমার দ্বারা কোন কাজই হবেনা।

—ওমা, তবে কি উপায় হবে?—বলে, রাধারাণী দু'চার ইঞ্চি এগিয়ে বসলো।

সিদ্ধবাবা রাধারাণীর দিকে সিদ্ধপুরুষোচিত ভাববিহ্বল নয়নে

চেয়ে—রাধে, হবে না বল্লেই কি মাকে ছেড়ে দিলাম? আমি ধ্যানে এমনই গাঢ়তা আন্লাম যাতে করে মা একেবারে নাগপাশের মত ধ্যান-পাশের কঠিন বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেলেন। পালাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করলেও মা আব এক পাও নড়তে পারলেন না।

রাধারাণী চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে—ভা-রী মজা তো!

—ভারি মজা। মা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। মা বল্লেন —আরে করিস কি, করিস কি? ছেড়ে দে বেটা শীগ্‌গির ছেড়ে দে। ভোলানাথকে সিদ্ধি ঘুঁটে গাঁজা সেজে দিয়ে আসিনি, নন্দী ভৃঙ্গী ছোঁড়া ছ'টোকে খেতে দিয়ে আসিনি—তারা হয়ত ক্ষিধেয় ছট্‌ফট্ করচে—সদাশিব হয়ত রেগে টং হয়ে আছেন। দে বাবা ছেড়ে দে, লক্ষ্মী আমার, সোনার চাঁদ আমার।

—ছেড়ে দিলেন?

—না গো রাধে, না, অত সহজে কি ছাড়ি। মাকে বল্লাম— গোপীকারঞ্জনকে জেলের দায় থেকে বাঁচিয়ে দাও মা, তোমাকে একক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

—মা কি বল্লেন, রাধারাণী অধীরতার সহিত জিজ্ঞেস করলে।

—মা বল্লেন, তুই ছোঁড়া ভা-রী নাছোড়বান্দা। যা "মকদ্দমা-কালী"কে ডাকগে—যা করতে হয় সেই করবে—গোপীকারঞ্জনের জেল হবে না। বলেই মা অন্তর্ধান করলেন।

সচাকত ভাবে রাধারাণী—"মকদ্দমা-কালী"? তিনি আবার কে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মকদ্দমা কালীই। একটু আগে বল্‌লাম না, জগন্মাতার অনন্তরূপ? মকদ্দমা কালী জগন্মাতার অনন্তরূপের একটি রূপ।

—কি আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্যের কিছুই নেই রাধেশ্বরী। সামান্য লেখবার কালি তারই কতরূপ ভুষো, লাল, নীল, কস, কালো, সোনালী, রূপালী, বেগুনী আরো কত কি। আর জগন্মাতা হলেন গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের ঘরণী তাঁর কি রূপের অন্ত আছে? তিনি ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, দক্ষিণাকালী, রক্ষাকালী, কিরিটীকালী, ঠনঠনেকালী, চাকুরীকালী, ডাকাতেকালী, জয়কালী, ক্ষয়কালী, মকদ্দমাকালী আরো কত কি। মায়ের রূপের কি আর অবধি আছে?

রাধারাণী সবিস্ময়ে—বাব্বা, এত রকম কালী আছেন। মকদ্দমা কালীকে ডেকেছিলেন?

—ডেকেছিলাম বই কি রাধে।

—কি বল্‌লেন?

—যা বল্‌লেন তা কি তোমরা করবে?

—কি যে বলেন। আপনি স্বয়ং ভগবান। মায়ের আদেশ আর আপনার আদেশ কি কিছু তফাৎ আছে। আপনার আদেশ, মায়ের আদেশ পালন করবো সেত মহা ভাগ্যের কথা। কি করতে হবে আদেশ করুন, আমি এখুনি তা করতে রাজি আছি।

—রাধে তুমি সত্যি বড় ভক্তিমতী। আমার এইবারের লীলা শেষের পর তুমিই হবে আশ্রম-পালিকা। শোন মকদ্দমাকালী কি বল্‌লেন। মা বল্‌লেন, যেমন জগন্মাতার অনন্তরূপ, যমের বাড়ী যাওয়ার অনন্তপথ, অঙ্গনামনের অনন্তগতি, তেম্‌নি মকদ্দমা জেত্‌বারও অনন্ত উপায়। শুধু স্বত্ব ও সত্যের দ্বারা সব মকদ্দমা জেতা যায় না। কোন কোন সময় দলিল জাল করতেও হয়, নথী সরাতেও হয়, সাক্ষী ভাগাতেও হয়, মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় করতে হয়, দপ্তরের ছোট-বড় কেরাণীদের ঘুষে বশ করতে হয়, বিপক্ষের উকীলকে টাকায় কিনে নিতে হয়, হাকিম আর তার উপরওয়ালা তার স্ত্রীকে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, প্রলোভন দেখিয়ে মুঠোর মধ্যে আনতে হয়। টং-টং করে বারটা বেজে গেল।

—এসব কি করে হবে?

—সে কথা তোমার সঙ্গে পরে হবে রাধে। আজ, অনেক রাত্রি হয়েচে এখন বিশ্রাম করগে।

—বা-বার যা ইচ্ছে। বলে রাধারাণী মাথার কাপড় খানিকটা টেনে দিলে।

পেনশন নিয়ে বেকার বসে থাকায় যমদূতরা সময় সময় মনের দুয়ারে এসে হানা দিয়ে যাচ্ছিল। এতে ভয় পেয়ে অবসর-প্রাপ্ত বন্ধুদের অনুকরণে নিত্য শ্রীপাঠাদি শুনে সোজাপথে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার যোগাড় কর্‌ছিলাম। মৃদুলা নিত্য সিদ্ধবাবার আশ্রমে যাওয়া-আসা

করছিলেন। তার ইচ্ছা আমার পেনশন-প্রাপ্ত বন্ধুবান্ধবদের মত আমিও দীক্ষা নিয়ে রাতারাতি ভক্ত হয়ে উঠি। মৃত্যু ও দাসত্ব এই উভয় সঙ্কটে পড়ে যখন কাশীবাসের স্বপ্নজাল বুন্‌ছিলাম আর খুলছিলাম এমন সময়ে হঠাৎ একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুলা এসে বল্‌লেন, ওগো শুনচো, তোমার একটা চাকরী যোগাড় করে এলাম, পশু'ই খুলনা যেতে হবে।

শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—বলোকি আমার চাকরী?

—হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমারই, আমার নয়। রাণীদিকে ধরে বাগিয়ে নিলাম কাজটা।

—হুঁ! কাজটা কি শুনি?

—সিদ্ধবাবার খাস কেরাণীর কাজ। প্রথম মাসেই দু'শ' দেবে।

—সিদ্ধবাবা এত টাকা পাবে কোথায়। তোমার যত ফষ্টি-নষ্টি।

—কী-যে বলে শোন। সিদ্ধবাবার টাকার অভাব? টাকার আণ্ডিল সে। রাধারাণীর যে গয়না-গাটি সে সবইত বাবার দেওয়া।

—কে বললে তোমায়?

—কেন, রাণীদি নিজেই—আবার কে বলবে?

আমি মনে মনে ভাবলাম—সিদ্ধবাবা অনেক বিষয়েই স্বয়ং-সিদ্ধ; আর এই রাধারাণীই হচ্ছে গিয়ে সিদ্ধবাবার টোপ যার ফাঁদে পড়ে জড়-বুদ্ধি ও ধর্ম্মান্ধ—এ-দুই বাবার ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করচে।

—অমন গুম হয়ে কি ভাবচো?

—তাবাচ, সিদ্ধবাবা রইলেন এখানে আর তার কেরাণী খুলনা গিয়ে কি করবে?

ঐত তোমার দোষ! সব-জান্তা হওয়া চাই! খুলনায় গিয়ে কি করবে সে খবরে তোমার কি কাজ? যেতে বলচে, চলো। সিদ্ধবাবার এক কথা। হাকিমের হুকুম নড়লেও সিদ্ধবাবার কথার নড়চড় নেই। আশ্রমের সবাই, এমন কি রাণীদিও একটি টুঁ-শব্দটি না করে সিদ্ধবাবা যা বলেন তাই করে। সিদ্ধবাবা সাক্ষাৎ ভগবান।

—নিশ্চয়, নিশ্চয় বলে আমি চুপ করলাম। ধূর্ত্তামিতে সিদ্ধহস্ত সিদ্ধবাবার আর রাধারাণীর নূতন করে কি দূরভিসন্ধি সাধনে সচেষ্ট হয়েচে সে দুর্ভাবনায় মন আমার তখনকার মত ডুবে গেলে—আমি মৃদুলার উপস্থিতি আর চায়ের মৌতাত দু-ই ভুলে গেলাম।

তিনচার দিন হলো খুলনায় এসেচি, মৃদুলার কী আনন্দ! আমার দু'শ' টাকা আয় বৃদ্ধি তার ওপর খুলনার বাজারে কলকাতার আধাদরে ঘি-দুধ-মাছ আর শাক-সব্জি পেয়ে সরোবরে শতদলটির মত মৃদুলা আনন্দ অধিরতায় টলমল। তার আনন্দের ওপর আরো আনন্দ বসন্তবিলাসের মেয়ে রেবারাণীকে পড়শী পেয়ে। কালীকৃষ্ণ এখন খুলনার ডেপুটী—আমাদের বাড়ীর একখানা বাড়ী পরেই তাদের ছবির মত সুন্দর বাংলো। রেবার সঙ্গে একদিনেই মৃদুলার পূর্ব্বের আলাপ জমে উঠেছে। মৃদুলা নিত্য দুপুরে না গেলে রেবা মান-অভিমানের পালা শুরু করে।

নির্জ্জনতা রেবার ভাল লাগেনা। সে চায় লোকজনের আসা-যাওয়ায় বাড়ী সরগরম থাকে। কিন্তু স্বামী ডেপুটী তার অমিশুক বলে তাদের বাড়ীতে সাধারণ লোকজনের বড় যাতায়াত নেই। রেবার বাপের বাড়ীতে প্রজা, উমেদার, তাঁবেদার, দেনা-পাওনাদার—আরো কত রকম লোকের সদা সংঘট। তাই রেবাকে খুশি করতে কালীকৃষ্ণ এক মজার ফন্দি বেরে করচে। যেখানেই বদ্‌লি হোক না কেন নগদ দামে সে কখনো কোন জিনিস কেনে না। কাজেই বাড়ীতে হামেশাই পাওনাদারের আনাগোনা লেগেই থাকে আর এই হট্টগোলে রেবা ঠিক ছেলেমানুষটিরই মত খুশি হয়। কালীকৃষ্ণের আর একটা বৈশিষ্ট্য, সে জোড়ে ছাড়া কোন সামাজিকতা রক্ষা করতে যায় না। এই পত্নী-প্রেমের অপূর্ব্বত্বে সে সর্ব্বত্রই অমরত্ব লাভ করে আসচে। আর এরি জন্যে সদরে কালীকৃষ্ণও উপর-আলা হলেও অন্দরে রেবাই সদর-আলা।

আমাদের পিঠো-পিঠি সিদ্ধবাবা ও রাধারাণী এক বিরাট লটবহর নিয়ে এসে আমাদেরই বাসায় উঠলো। এবং সাময়িকভাবে বাসাটাকে 'আশ্রমে' পরিণত করে ফেল্‌লে পরের দিনই দুপুরবেলা মৃদুলার সঙ্গে রাধারাণীও রেবাদের বাড়ীতে গেল। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর রাধারাণীকে রেবা জিজ্ঞাসা করলে—এসেচেন যখন থাকবেনত কিছুদিন ?

—না মেয়ে থাকবার যো নেই; যজ্ঞিটা শেষ হলেই চলে যাবো।

—ও আপনারা যজ্ঞি করতে এসেচেন! কিসের যজ্ঞি ?

—দাসপুরের জমিদারবাবুর স্ত্রী সিদ্ধবাবাকে খুব ভক্তি করে; জমিদারবাবুর বড় বিপদ—কয়েদ খালাসীর আসামী হয়েচেন। কে নাকি এক কালীকেষ্টা ডেপুটি আছে এখানে—ভা-রী কড়া হাকিম নাকি সে। সকলেই বলচে জমিদারকে জেলে দেবেই সে। বাবাও বলেচেন—দেখি কার সাদ্ধি জেলে দেয়—আমি মারণ-যজ্ঞি করবো।

মৃদুলা আতঙ্কিতা হয়ে—ওমা তাই নাকি, রাণীদি? আমরাত এর কিছুছুই জানিনে। কালীবাবু যে রেবার স্বামী, রাণীদি।

—তাই নাকি? তবেত বড় বিপদের কথা হলো—বলেই রাধারাণী রেবার আতঙ্ক-ক্লিষ্ট মুখখানি অপাঙ্গে দেখে নিলে।

আকুলিত কণ্ঠে রেবা জিজ্ঞেস করলে—আইনত বিচার করেন এতে বিপদের কি আছে?

রাধারাণী অন্তরে খুশি হয়ে—বিপদ নয় বলো কি মেয়ে? আগে কি ছাই জান্‌তাম ডেপুটীবাবু তোমার স্বামী। এখনত আর উপায় নেই—বাবা অভিচার-যজ্ঞে হোতা হয়েচেন। যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে।

—তাতে কি হয়েচে?—রেবা উদ্বেগাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে।

—শুনে আর কি হবে এখন—বলে, রাধারাণী ছলকরে চোখের জল মুছলে আঁচলে।

—তবু শুনি?—বলে রেবা জীদ করলে।

রাধারাণী যেন বড়ই অনিচ্ছায় বল্‌তে লাগলো এমন ভাব দেখিয়ে —বাবা সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করে যার নাম করে যজ্ঞে পূর্ণ আহুতি

দেবেন তক্‌খনি সে সন্ন্যাস রোগে মুখে রক্ত উঠে ঢলে পড়বে। আর যমদূতরা এসে তার আত্মাটাকে কাঁটাবন দিয়ে টেনে হিঁচড়ে কুম্ভীপাকে নিয়ে ফেল্‌বে—সেখানে হাজার হাজার মানুষ-খেকো কুমীর তাকে খাব্‌লে খাব্‌লে খাবে।

রেবা মূর্চ্ছা গেলো। মৃদুলা ও রাধারাণী তার চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। জ্ঞান হতেই রাধারাণীর পা' দু'টো জড়িয়ে ধরে—রক্ষে কর মা, রক্ষে কর—বলে রেবা কাঁদতে লাগলো। রেবার অবস্থা দেখে মৃদুলার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সেও রাধারাণীকে অনেক করে বল্লে, যাতে সিংবাবাকে বলে যজ্ঞিটা বন্ধ রাখা যায়।

রাধারাণী গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—যজ্ঞি বন্ধ! অসম্ভব! আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়তে পারে, বাবার কথার নড়-চড় হবে না। তার চেয়ে যাতে জমিদারবাবু খালাস পায় তাই করো—আমি বাবাকে বলে আহুতি দেয়া বন্ধ রাখবো।

—বে-আইনী করতে তিনি রাজি হবেন না—বলে রেবা তার জলে-ভেজা চোখদুটি কাতরভাবে রাধারাণীর মুখের ওপর ধরলে।

—রাজি না হলে কি আর করবো বলো—বলে উঠবার ভঙ্গি করলে।

মৃদুলা জিজ্ঞেস করলে—রাধারাণীদি কোনইকি উপায় নেই?

—না, সকল্প পড়া হয়ে গেছে।

রেবা দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছা গেলো। জ্ঞান ফিরেচে দেখে মৃদুলা

বল্‌লে—অমন উতলা হ'য়ো না। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকো। দেখি চেষ্টা চরিত্তি করে কোন সুরাহা করতে পারি কিনা। এই কাল্পনিক আশ্বাস দিয়ে মৃদুলা বিষণ্ণমনে রাধারাণীর অনুগমন করলে।

পরের দিন বিষণ্ণমুখে রেবাই রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করতে এলো। মৃদুলা রাধারাণীকে বল্‌লে—বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েচে রেবাকে বলো। রাধারাণী আড়চোখে রেবাকে দেখে নিয়ে—বলে আর কি হবে? ওরা তন্ত্রের মারণ, উচাটন, বশীকরণ বিশ্বাস করে না। খাঁটি ইংরেজ-গোরা যা বিশ্বাস করে তু'পাত। ইংরেজি পড়ে আর তু'টো পাশবালিশের ওয়াড় পরে বাংগালী তা বিশ্বাস করে না। ও-সব খিষ্টানীর মধ্যে আমি নেই—বল্‌তে হয় তুমিই বলো। মৃদুলা বল্‌লে—বাবা রাজি হয়েচেন আহুতি দেবেন না; কিন্তু জমিদারকে খালাস দিতে হবে কালীবাবুর।

—কত বল্‌লাম, কত বোঝালাম, তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।

রাধারাণী একটু নরম গলায়—ওকি একটা কথা হলো মেয়ে? স্ত্রীর কথা যে না শোনে সে আবার কি রকম স্বামী? স্ত্রীর কথায় উঠ্‌বে-বস্‌বে, মরবে-বাঁচবে তবেত স্বামী? ভালকথায় না শোনে— কান্নাকাটি করো, উপোস দাও, ভূঁয়ে শোও, সুমুকে যেওনা। এতেও কাজ না হয়—বিষ খাবো, গলায় দড়ি দেবো, জলে ডুবে মরবো, য়্যাসিড খাবো, কেরাসিন জ্বালিয়ে মরবো—বলে ভয় দেখাও। দেখবে বাপ বাপ বলে খালাস দেবার পথ পাবে না। যাও বাড়ী যাও;

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি করবে? স্বামীকে বাঁচাতে চাও—যা বল্‌লাম করোগে।

সোমবার এস্-ডি-ও'র কোর্টে লোকে লোকারণ্য, সকলেই অত্যুল্লাসে প্রত্যাশা করচে জমিদারের জেল হবে; কিন্তু রায় বেরুল—বেকসুর খালাস।

**শেষ**